চাঁদমামা
ডিসেম্বর ১৯৭২
৭০
P

Photo by: MADAN GOPAL

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!
ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার
প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়
শিশুদের বদহজম, অম্বল, পেটব্যাথা, বায়ু, ও দাঁতউঠার সময় ব্যাথার একটি সুস্বাদু সুনিশ্চিত সমাধান
GRIPE
WATER
ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

রসেভরা...মনেরমত...মজাদার
মাত্র ২৫ পয়সা!
PARLE POPPINS FRUITY SWEETS
নতুন পার্লে
পপিন্স
ফলের স্বাদেভরা লজেন্স
লেবু, জামীর, কমলালেবু, আনারস আর র‍্যাস্পবেরী—এই ৫টি
ফলের স্বাদে ভরপুর কমদামের সুন্দর সুন্দর প্যাকে খুব সুস্বাদু
১৩ টি লজেন্স পাওয়া যাচ্ছে।
৫টি ফলের মজা পাবেন, পপিন্স যখনই খাবেন
everest/122d/PPI ben
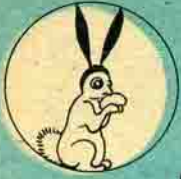
চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি, নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি

এবারের বেতাল কথা 'চোরের সম্মান' যেন এক বাস্তবধর্মী কাহিনী। এই কাহিনীর রাজা ব্যবসাদার বা ধনীদের হাতের পুতুল। এই রাজার আমলে ধনী আরও ধনী হচ্ছে ; গরীব হচ্ছে আরও গরীব। শেষ পর্যন্ত রাজা কাদের সাথে হাত মেলালেন তা জানার আগ্রহ নিশ্চয় আছে?

'যেমন কর্ম' কাহিনীর রাজা সিংহাসনে বসার জন্য নিজের ভাইকে হত্যা করাল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই রাজার কি হাল হল তা পাঠক পড়ে আনন্দ পাবে।

এই দুটি কাহিনী ছাড়া আরও আছে : একদিনের রাজা, যক্ষ পর্বত, বুদ্ধির দৌড়, পেটে কথা থাকে না, সাবধানী, উফ্, মেওয়া এবং মহাভারত ও শিবপুরাণ প্রভৃতি।

খণ্ড ১ ডিসেম্বর ১৯৭২ সংখ্যা ৬

সর্পাঃ পিবন্তি পবনম্, ন চ দুর্বলা স্তে ;
শুষ্কৈ স্তৃণৈর্বনগজা বলিনো ভবন্তি ;
কন্দৈফলৈ র্মুনিবরাঃ ক্ষপয়ন্তি কালম্ ;
সন্তোষ এব পুরুষস্য পরম নিধানম্। ॥ ১ ॥

[সর্প বায়ু সেবন করে দুর্বল হয় না ; জঙ্গলী হাতী ঘাস খেয়েও বলশালী ; মুনি গণ কন্দ, মূল ও ফল খেয়েও নিজেদের জীবন নির্বাহ করে ; তাই মানুষের কাছে সন্তোষই সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস।]

সন্তু ষত্যুত্তমঃ স্তুত্বা,
ধনেন মহতা ধমঃ,
প্রসীদন্তি জপৈ র্দেবা,
বলিভি র্ভূত বিগ্রহাঃ। ॥ ২ ॥

[উত্তম ব্যক্তি প্রশংসা পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে, নীচ ব্যক্তি ধন পেয়ে খুশী হয়। প্রার্থনা পেয়ে দেবতাপ্রসন্ন হন কিন্তু ভূত বলি দিলে খুশী হন।]

সর্বহিংসা নিবৃত্তা য়ে
নরাঃ, সর্ব সহাশ্চ য়ে,
সর্ব স্বাশ্রয় ভূতাশ্চ,
তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ। ॥ ৩ ॥

[যাঁরা কোন প্রকার হিংসার আশ্রয় না নিয়ে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন সহ্য করতে করতে সবাইকে সাহার্য্য করেন, তারা স্বর্গ সুখ-প্রাপ্ত হয়।]

সন্তোষ

তিন চোর

প্রাচীনকালে গ্রীক দেশে এক দম্পতী বাস করত। তাদের অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল। একদিন বৃদ্ধ স্বামী স্ত্রীকে বলল, "টাকা পয়সার ভীষণ অভাব পড়ে গেছে। এদিকে আমার পায়ে ব্যথা। হাঁটতে পারছি না। তুমি গরুটাকে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে এসো।" বুড়ী গরুটাকে নিয়ে হাটের পথে চলল। অন্য দিকে তিনটে চোর ঐ গরুটাকে কম দামে কেনার তাল করল।

ঐ তিনজনের একজন চোর বুড়ীর কাছে এসে বলল, "দিদিমা, তুমি এই ছাগলটাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ? বেচবে নাকি ? কততে বেচবে ?"

"পাজি, তুই কি চোখের মাথা খেয়েছিস ? গরুটাকে ছাগল দেখছিস ?" বুড়ী ধমক দিয়ে এগিয়ে গেল।

চোর বলল, "দিদিমা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? ছাগলকে একেবারে গরু বানিয়ে ফেলেছ ! হাটে যাচ্ছ কেন ? আমি তিরিশ মুদ্রা দিচ্ছি, আমার কাছে বিক্রী করে দাও।"

বুড়ী চোরের পিঠে একটা লাঠির বাড়ি মেরে নিজের পথে এগিয়ে যায়।

কিছু দূর যাওয়ার পর দ্বিতীয় চোর বুড়ীকে বলল, "ঠাকুমা, চললে কোথায় ?"

"হাটে যাচ্ছি বাবা, তোর ঠাকুর্দা এটাকে বিক্রী করে আসতে বলেছে।" বুড়ী জবাবে বলল।

"বেশতো পঁচিশ মুদ্রায় আমি কিনে নিচ্ছি। আমার কাছে বিক্রী করে দাও।" দ্বিতীয় চোর বলল।

"তোর মাথা খারাপ হয়নি তো। এত ভাল গরুটাকে ছাগলের দামে কিনতে চাইছিস।" বুড়ী ধমক দিল।

দ্বিতীয় চোর অবাক হওয়ার অভিনয়

মনতোষ সেন
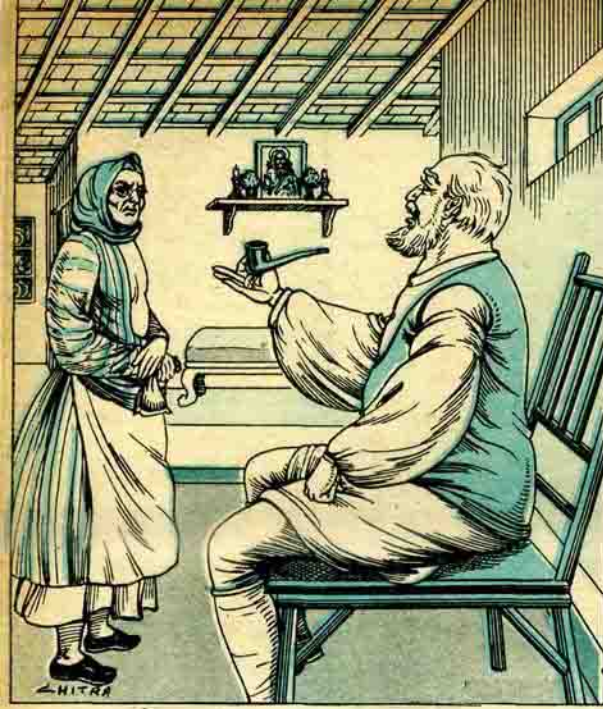
করে বলল, "ঠাকুমা তোমার চোখে ঠিক পর্দা পড়েছে। তাই ঝাপসা দেখছ। তা না হলে ছাগলকে গরু বলতে না।"

"বেশ। আমি চোখে ঝাপসা দেখছি। যাও, আমি বেচব না।" বুড়ী রেগে গিয়ে এগিয়ে চলল। কিন্তু তার মনে খটকা লাগল। সে তো গরু নিয়ে বেরিয়ে ছিল কিন্তু এখন তো একে একে সবাই ছাগল বলছে! কি ব্যাপার! এ সব কথা ভাবতে ভাবতে বুড়ী এগোচ্ছে এমন সময় তৃতীয় চোর হাজির হয়ে বলল, "আরে মাইমা, ছাগলটাকে বিক্রী করতে যাচ্ছ নাকি? তা আমার কাছে বিক্রী কর না। কুড়িটা মুদ্রা দেব।"

"তোর কথা শুনে তো বাবা আমার অবাক লাগছে। একজন বলছে তিরিশ মুদ্রা, আর একজন পঁচিশ মুদ্রা, যাক তুই তিরিশ মুদ্রা দে, বিক্রী করে দেব।" বুড়ী বলল।

"মাইমা, অন্য লোক হলে দিতাম না। শুধু তুমি বলে দিচ্ছি। নাও তিরিশ মুদ্রা।" তৃতীয় চোর বলল।

বুড়ী শেষে গরুটাকে ছাগলের দামে বিক্রী করে বাড়ি ফিরে স্বামীকে সব কথা বলল। বুড়ো অনুমানে বুঝল যে অন্য পাড়ার ছেলেরা বুড়ীকে ঠকিয়েছে। সে বুড়ীকে বলল, "যাক যা হওয়ার তা হয়েছে। ও নিয়ে আর ভেব না। এখন ভবিষ্যতের কথা ভাবতে দাও।"

বুড়ো একদিন জঙ্গলে গিয়ে এক রকমের দুটো খরগোশ ধরে আনল। দুটো খরগোশ আলাদা আলাদা ঝুড়িতে রেখে বুড়ীকে বলল, "শোন, আমি একটু বেরোচ্ছি। আজ আমাদের বাড়িতে আত্মীয়দের আসার কথা আছে। তুমি মধুমাখা রুটি, পায়েস আর হাঁসের কষা মাংস রেঁধে রেখো। বাড়ি ফিরে আমি তোমাকে প্রশ্ন করব, কি রেঁধেছ, তুমি চট্‌পট্ বলবে, খরগোশ যা রাঁধতে বলেছে তাই রেঁধেছি, ব্যাস্ এর বেশি অন্য কোন কথা বলবে না।" এ কথা বলে বুড়ো

বাড়ি থেকে বেরুল।

বুড়ো যখন অন্য গ্রামে গেল তখন ঐ তিনজন চোর মদ খেয়ে টলতে টলতে তার দিকেই আসছিল। তারা বুড়োকে দেখে বলল, "আরে এই বুড়ো। তোমার বউটা যেন কেমন, কোন্‌টা গরু আর কোন্‌টা ছাগল তাও চেনেনা।

"দূর দূর ঐটাকে নিয়ে আমিও আর পারছি না। শুধু একটা গুণ আছে। ভাল রাঁধতে পারে।" বুড়ো বলল।

"তাহলে তো ভালই।" চোর বলল।

বুড়ো যেন ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেল এমন অভিনয় করল। বলল, "ভাবছি, আজকে কি রান্না করতে বলব। আমার তো ইচ্ছা করছে পায়েস খেতে। আর তার সাথে খেতে চাই হাঁসের কষা মাংস, মধুমাখা রুটি।" এ কথা বলে বুড়ো ঝুড়ি থেকে খরগোশকে বের করে ওটাকে বলল, "এই শোন, তোর মাকে গিয়ে বল, পায়েস, হাঁসের কষা মাংস আর মধুমাখা রুটি রাঁধতে।" বলে খরগোশকে ঐ বুড়ো ছেড়ে দিল। সেটা দুলাফে পালাল।

"আরে, এতো এক বিচিত্র ব্যাপার। তুমি যা বললে এই খরগোশটা কি সত্যি সত্যি বাড়িতে গিয়ে বলবে?" চোরগুলো জিজ্ঞেস করল।

"কেন বলবে না। এতটুকু থেকে এই
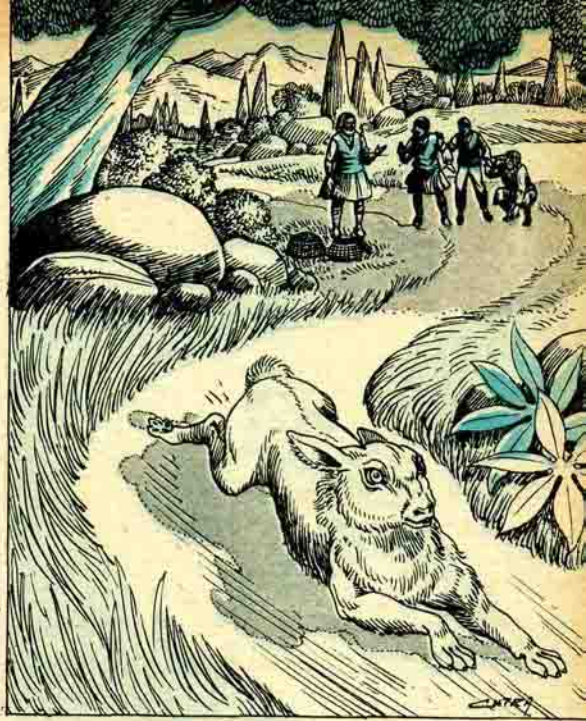
খরগোশটাকে পুষেছি, কেন শুনবে না! তোমাদের বিশ্বাস না হলে চল আমার সাথে, তোমরাও খেয়ে আসবে।"

ঐ তিনজন চোর বুড়োর সাথে তার বাড়িতে এল। বুড়ো বউকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি রান্না করলে?"

"খরগোশ যা রাঁধতে বলেছে তাই রান্না করেছি।" বলল ঐ বুড়ী। তারপর বুড়ী ঐ চারজনকে একসাথে খেতে দিল। বুড়ো যা বলেছিল বুড়ী ঠিক তাই রান্না করায় চোরগুলো নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কথা বলাবলি করল। তার-পর ঐ খরগোশকে কিনতে চাইল।

"খরগোশ বিক্রী করব? না না তা

পারব না।" বুড়ো বলল। চোরগুলো দশ হাজার মুদ্রায় কিনতে চাইল।

"বেচারা ওরা যখন অত করে কিনতে চাইছে, দাওনা বিক্রী করে। অভাব অভাব বলছিলে না ?" বুড়ী বলল।

"আরে আমাদের সুন্দর গরুটাই যখন ছাগলে বদলে গেল তখন এই খরগোশটাও যদি বদলে যায় ?" বুড়ো বলল।

চোরগুলো নিজেদের মধ্যে চোখ টেপা-টেপি করে একসাথে বলল, "না না এটা বদলাবে না। আমরা চোখে চোখে রাখব। সে দায়িত্ব আমাদের।"

দশ হাজার মুদ্রায় বুড়ো তার দ্বিতীয় খরগোশটাকে চোরদের কাছে বিক্রী করে দিল।

চোরগুলো বলাবলি করল, "আচ্ছা এক কাজ করি। বাড়িতে যাওয়ার আগে আমাদের সকলের বাড়িতে বউদের কাছে কি কি রাঁধতে হবে খবর পাঠিয়ে দি।" এ কথা বলে প্রত্যেক চোর নিজের নিজের বাড়িতে বউএর কাছে খবর পাঠিয়ে দিল।

প্রত্যেক চোর নিজের নিজের বাড়িতে গিয়ে বুঝল যে খরগোশ কোন খবরই পেঁৗছে দেয়নি। তখন ওরা বুঝল যে বুড়ো তাদের ঠকিয়েছে। ওরা মনে মনে বুড়োকে গালাগালি দিল।

বুড়োর কাছে চোরগুলো গিয়ে তাকে যা-তা বলল। বুড়ো ওদের গালাগাল শুনে বলল, "খরগোশকে খবর দিয়ে পাঠানোর আগে তার পিঠে হাত বুলিয়েছ ?" চোরগুলো জানাল যে ওরকম কিছু করেনি।

"তাহলে আর কি। খরগোশ নিশ্চয় এক মুঠো বাতাস হয়ে হাওয়ায় মিশে গেছে।" বুড়ো বলল।

"খরগোশ আবার হাওয়ায় মিশে যাবে কেন ? পাগলের কেন মত কথা বলছ ?"

"অতবড় গরু যদি ছাগল হয়ে যায়, এতটুকু খরগোশ একমুঠো হাওয়া হতে পারে না ?" বুড়ো জিজ্ঞেস করল।

বুড়ো তাদের প্রতি বদলা নিয়েছে বুঝে ওরা মাথা নীচু করে চলে গেল।

এক গ্রামের সমস্ত কিষাণ ছিল বৈষ্ণব এবং সব মজুর ছিল শৈব। ঐ মজুররা ভাবত কিষাণরা তাদের খাতির করছে না। শৈব মজুররা ভাবল বৈষ্ণব কিষাণ-দের অহঙ্কার চূর্ণ করতে হবে। ওরা সবাই শিবের আরাধনা করল। শিব দর্শন দিয়ে বললেন, "কি চাও বল ?"

"হে পরমেশ্বর, এই গ্রামের কিষাণরা নিজেদের সম্পত্তির ব্যাপারে ভীষণ গর্বিত। ঠিক সময়ে বৃষ্টি হওয়ার ফলে প্রত্যেক বছর এদের সম্পত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের অহঙ্কার চূর্ণ করতে আপনাকে কিছু একটা করতে হবে।" শিব-ভক্তরা প্রার্থনা করল।

"ঠিক আছে। আমি চোখ বুজে বসছি। যতক্ষণ না চোখ খুলছি, বৃষ্টি হবে না।" শিব ভক্তদের বললেন।

আর যায় কোথায়! শিব-ভক্তরা গ্রামে গিয়ে প্রচার করতে লাগল, "শিব চোখ বুঝে ফেলেছেন। এ বছর বৃষ্টি হবে না। তোমাদের দম্ভ চূর্ণ হবে।"

এ কথা শুনে কিষাণরা ঘাবড়ে গেল। ওরা সবাই নিজেদের আরাধ্য দেবতার আরাধনা করল। বিষ্ণু দর্শন দিয়ে বললেন, "তোমরা কি চাও, বল ?"

কিষাণরা ভগবান বিষ্ণুকে বলল, "ভগবান, শিব ভক্তরা শিবের চোখ বুঝিয়ে দিয়েছে। উনি যতক্ষণ না চোখ খুলছেন বৃষ্টি হবে না।"

"তোমরা নতুন পাত্র এনে জল ভর্তি করে তাতে ব্যাঙ ছেড়ে দাও। ঠাণ্ডা জল পেতেই ব্যাঙগুলো ডাকতে শুরু করে দেবে। তারপর দেখি কেমন বৃষ্টি না হয়।" বিষ্ণু বললেন। কিষাণরা বিষ্ণুর কথামত কাজ করল।

শিব ব্যাঙের ডাক শুনেই ভাবলেন,

কৃষ্ণা ভদ্র

আমি তো বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছি। ব্যাঙ ডাকছে কেন? কি হোল! ভাবতে ভাবতে শিব চোখ খুললেন। আর তখনি মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। কিষাণরা খেতে লাঙল ফেলল। বীজ বপন করল। চারা পুঁতল। এ সব দেখে শিব-ভক্তরা আবার শিবের আরাধনা শুরু করে দিল। শিব দর্শন দিলেন।

"হে পরমেশ্বর! বৃষ্টি হল যে! কিষাণরা যে বীজ বপন করেছে। ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে এ বছর ফসল অনেক বেশি হবে।" শিব-ভক্তরা বলল।

"বেশি হলে হোক না। দেখ না আমি এমন কাণ্ড করব যে ওরা মোট দুশো কুনকের বেশি ধান ঘরে তুলতে পারবে না।" শিব ওদের বুঝিয়ে বললেন।

ব্যাস্ আর যায় কোথায়! শিব-ভক্তরা কিষাণদের উপহাস করে বলল, "তোমরা ফসল ফলানোর আনন্দে যতই বগল বাজাও না কেন মোট দুশো কুনকের বেশি একদানাও ঘরে তুলতে পারবে না।"

এ-কথা শুনে কিষাণরা আবার ভগবান বিষ্ণুকে প্রার্থনা করলেন। বিষ্ণু দর্শন দিলে কিষাণরা তাঁকে বলল, "ভগবান, আমরা যতই খাটি, যত ফসলই ক্ষেতে হোক, ঘরে নাকি দুশো কুনকের বেশি ফসল তুলতে পারব না। এখন আমাদের কি হবে?"

"তোমরা প্রত্যেক বিঘা জমিতেই দশটা করে ধানের গোলা করে ফেল।" বলেই বিষ্ণু অন্তর্ধান হলেন।

এত গোলা দেখে শিব-ভক্তরা আরাধনা করল শিবের। শিব দর্শন দিলে তাঁকে বলল, "পরমেশ্বর, এ-বছর কিষাণরা অনেক বেশী ধনী হচ্ছে যে!"

"হে ভক্তগণ, এখন আমি আর কি করতে পারি। তোমাদের পেটেতো কথা থাকে না। তোমরা তো আগে ভাগে ঢাক পিটিয়ে বেড়াও। তাই, আমার সাহায্য তোমাদের কোন কাজে আসছে না।" একথা বলে শিব অন্তর্ধান হলেন।

পাঁচ

[গণ্ডক জাতের যুবকদের কথামত এগোতে এগোতে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত নদীর তীরে গেল। অন্ধকার নেমে এলো। লুণ্ঠনকারীদের আক্রমণ করতে যাবে এমন সময় ওরা দেখতে পেল পাহাড়ের গুহা থেকে এক ভয়ঙ্কর বিচিত্ররূপী মানুষ বেরিয়ে আসছে। তার সারা গায়ে খাড়া খাড়া চুল। সেই লোমশভূত ঐ লুণ্ঠনকারীদের দিকে ছুটতে ছুটতে আসছে। তারপর...]

আগুনের কাছে বসে নিজের অনুচরদের সাথে কথা বলার সময় হঠাৎ লুণ্ঠন নেতা দেখতে পেল গুহা থেকে গর্জন করতে করতে এক বিকৃত জটাধারী ওদের দিকে ছুটে আসছে। তার হাতে এক জ্বলন্ত মশাল।

"এ কেমনতর ভয়ঙ্কর আকৃতি রে বাবা! একি কোন রাক্ষস নাকি? না কি পাহাড়ী পিশাচ? তোমরা সবাই মুহূর্তে সাবধান হয়ে যাও! আমাদের এক্ষুনি বিপদের মোকাবিলা করতে হবে।" এ কথা বলে লুণ্ঠন নেতা ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল।

"বাবু, এখানে আর আমাদের থাকা উচিত হবে না। প্রাণে মারা যাব। এ নির্ঘাৎ মানুষ খেকো রাক্ষস।" এই কথা বলে লুণ্ঠন নেতার চারজন অনুচর সোজা নদী তীর ধরে ছুটতে লাগল।

“ওরে এই কাপুরুষের দল ! থাম ! আমরা এতজন আছি ! আর এই রাক্ষস একা আমাদের কি করতে পারে ? ফিরে এসো, আমরা সবাই মিলে মিশে একত্রে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি ।” লুণ্ঠন নেতা চিৎকার করে এই সব কথা বলতে বলতে ঐ অনুচরদের ডাকতে লাগল ।

তার কথায় তারা কান দিল না । ‘আপনি বাঁচলে বাপের নাম’ ভেবে ওদের কেউ ছুটল উটের দিকে আবার কেউ ছুটল নদীর তীর ধরে। ইতিমধ্যে ঘুমন্ত লুণ্ঠনকারীদের ঐ রাক্ষসটা পা দিয়ে ঠেলে তাদের কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিল ।

গাছের ডালে বসে খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে লাগল । তারা এই দৃশ্য দেখে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে গেল । গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ চারজন গণ্ডক জাতের লোক ভয়ে কাঁপতে লাগল ।

“খড়্গবর্মা, এই বিকৃত আকৃতিধারী কোন রাক্ষস অথবা কোন পিশাচ নয় । ঐ গুহার কোন তান্ত্রিক একে এই ধরনের রূপ ধারন করিয়ে পাঠিয়েছে । এ হয়ত তান্ত্রিকের শিষ্য হিসেবেই রয়েছে ।” জীবদত্ত বলল ।

“সে যাই হোক, আমরা যা করব ভেবেছিলাম তা এই তান্ত্রিক করছে যখন করুক । আমরা শুধু সব দেখতে থাকব । যেই লুণ্ঠনকারীরা চলে যাবে অমনি আমরা গিয়ে আমাদের স্বর্ণাচারিকে ভুট্টার বস্তার ভেতর থেকে উদ্ধার করে সোজা নিজেদের পথ ধরব ।” খড়্গবর্মা বুঝিয়ে বলল ।

ওই বিকৃত লোকটা কি করছে-না-করছে কিছুক্ষণ দেখে জীবদত্ত বলল, “খড়্গবর্মা, লুণ্ঠন নেতার বেশ হিম্মত আছে মনে হচ্ছে । ঐ দেখ নিজের লোককে জোগাড় করে ঐ বিকৃত লোকটাকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করার তাল করছে ।”

লুণ্ঠন নেতা নিজের পলায়ন রত দশ

বারজনের দিকে বল্লম উঁচিয়ে ভয় দেখাল। ওদের থামিয়ে ঐ বিকৃত লোকটাকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলল।

"এই আক্রমণের ফলে ঐ গুহার তান্ত্রিক এবং তার সৃষ্ট ঐ বিচিত্র ভয়ঙ্কর আকৃতির মহাশক্তির মৃত্যু হবে। ঐ বিকৃত রাক্ষসের মৃত্যুর পর লুণ্ঠন-নেতা ঐ গুহার কাছে যাবে। হত্যা করবে ঐ তান্ত্রিককে। কিছু একটা আমাদের করতে হবে। এখন লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে স্বর্ণাচারি উটের পায়ের নীচে পড়ে মারা না যায়। ওকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।" খড়্গবর্মা বলল।

খড়্গবর্মার কথা শেষ হতে না হতেই গুহার ভেতর থেকে এক ভয়ঙ্কর আগুনের হল্কা বেরুলো। তান্ত্রিক তেলে ভেজা মশালগুলোতে আগুন ধরিয়ে, 'শাম্ভবী! ভৈরবী!' বলে চিৎকার করে এক একটা জ্বলন্ত মশাল ঐ পাহাড়ের নীচের লুণ্ঠন-কারীদের উপর ছুঁড়তে লাগল।

জ্বলন্ত মশালগুলো লুণ্ঠনকারীদের উপর একে একে পড়তে লাগল। এই নতুন ধরনের আক্রমণ লক্ষ করে লুণ্ঠন নেতা ঘাবড়ে গিয়ে নিজের অনুচরদের বলল, "ওরে উষ্ট্রবীরেরা, এই বিকৃত পিশাচের মত আরও পিশাচ ঐ গুহার মধ্যে আছে মনে হচ্ছে। আর এখন যুদ্ধ করে কোন লাভ নেই। তোমাদের কয়েকজন ভুট্টার থলেগুলো নদীতে ফেলে দাও। জোয়ারে ভাসতে ভাসতে ওগুলো অন্য কোন প্রান্তে পৌঁছে যাবে। আমরা পরে ঐ ভুট্টার থলে জোগাড় করে নেব। বাকিরা গাছে বাঁধা উটগুলো ছাড়িয়ে, উটের উপর চড়ে নদী-তীর ধরে রওনা হয়ে যাও।" চিৎকার করে বলল।

লুণ্ঠন-নেতার নির্দেশ শুনে নদীপথ ধরে যারা ছুটে পালাচ্ছিল তারা এবং গাছের আড়ালে যারা লুকিয়ে ছিল তারা এগিয়ে গেল। কিছু লোক গাছে বাঁধা

উটগুলো খুলে দিল আর বাকিজন ভুট্টা-ভর্তি থলেগুলো নদীর জলে ফেলতে এগিয়ে গেল। ইতিমধ্যে গুহার ভেতর থেকে তান্ত্রিক বেরিয়ে এসে মশালটাকে নাড়াতে নাড়াতে বলল, "ওরে এই জটাধারী ভুত! নদীতে যারা ভুট্টার থলে ফেলছে তাদের ধরে ওদের নদীমাতার আহার করে ফেল। একজনও যাতে না পালাতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখ।"

যে বিকৃত ভয়ঙ্কর লোকটা এতক্ষণ পা দিয়ে হাত দিয়ে লুণ্ঠনকারীদের মার-ছিল সে এখন তান্ত্রিকের নির্দেশ পেয়ে ভুট্টার থলে নদীর জলে ফেলতে যাওয়া লোকগুলোর দিকে এগোল। ততক্ষণে কয়েকজন লুণ্ঠনকারী কাঁধে পিঠে ভুট্টার থলে ফেলে নদীর দিকে এগোচ্ছিল। জটাধারী ভয়ঙ্কর লোকটা ওদের এক একজনকে ধরে নদীতে ফেলতে লাগল। এই ঘটনা ঘটার সাথে সাথে লুণ্ঠন-কারীদের আর্তনাদে গোটা তল্লাট হা-হা-করে উঠল।

লোকের আর্তনাদ, চিৎকার প্রভৃতির ফলে গাছে বাঁধা উটগুলো দড়ি ছিঁড়ে সেই অন্ধকারে পালাতে লাগল। পালা-নোর সময় তারা লুণ্ঠনকারীদের মাড়িয়ে যেতে লাগল। কয়েকটা উট নদীর জলে গিয়ে পড়ল এবং স্রোতের সাথে ভেসে যেতে লাগল।

ঠিক সেই সময় একজনের আর্তনাদ শোনা গেল, 'আমাকে বাঁচান! আমাকে বাঁচান! আমাকে নদীতে ফেলবেন না!' আর তখনই ঝপ্ করে একটা থলি যেন নদীর জলে পড়ল।

"খড়্গবর্মা, তুমি কি শুনতে পারছ? চিনতে পারছ? এই আর্তনাদকারী আমার মনে হচ্ছে স্বর্ণাচারি! ওকে লুণ্ঠনকারীরা নদীর জলে ফেলে দিয়েছে। ভুট্টার থলি জলে ডুববে না। স্বর্ণাচারির মাথাটা বাইরে আছে। থলিটা ভাসতে ভাসতে কোন এক তীরে গিয়ে উঠবে। তবে আমরা একটু আগে চেষ্টা করলে

বোধ হয় তাকে উদ্ধার করতে পারতাম।” জীবদত্ত গাছ থেকে নাবতে নাবতে বলল।

খড়্গবর্মা তার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, “এখন কি করতে যাচ্ছ ?”

গণ্ডক জাতের একজনকে নদীতীরের কাছে যেতে বলব। হয়ত সে স্বর্ণাচারির চিৎকার শুনতে পাবে। বাকি তিনজনকে লুণ্ঠনকারীদের বধ করতে বলল।” জীবদত্ত বলল।

“তাহলে আমরা কি হাত গুটিয়ে এসব দেখতে দেখতে বসে থাকব ?” খড়্গবর্মা একটু রেগে গিয়ে বলল।

“খড়্গবর্মা! এখন তাড়াহুড়ো করো না। লুণ্ঠনকারীরা এখন ছোটাছুটি করছে বটে কিন্তু তাদের নেতা এখন ভুট্টার থলে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। এমন কি জটাধারী ভয়ঙ্কর লোকটাকে আক্রমণ করারও তাল করছে। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না সে তার অনুচরদের কি ভাবে মাঝে মাঝে নির্দেশ দিচ্ছে ? আমাদের অনুচরদের হাত থেকে বেঁচে পালানোর চেষ্টা করলে আমরা তাকে তীর বিদ্ধ করব। তার আগে আমাদের বুঝতে হবে এই জটাধারী এবং ঐ তান্ত্রিকের ব্যাপারটাকে।” জীবদত্ত বলল।
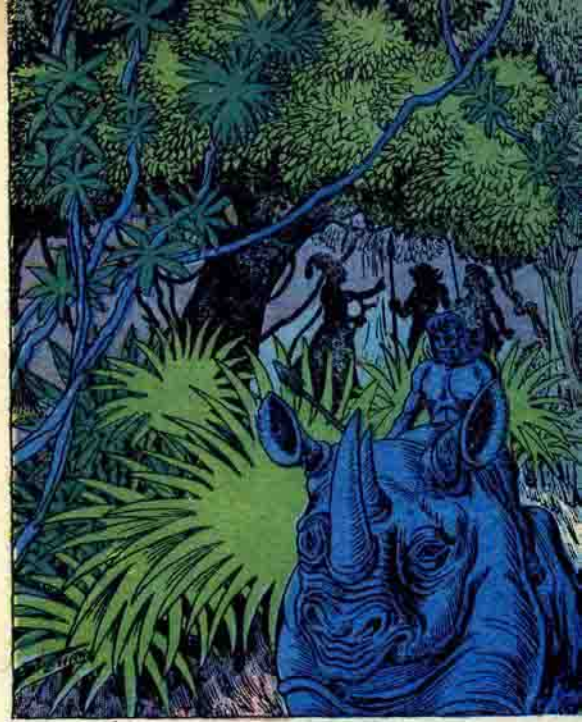
“ঠিক আছে। গণ্ডক-জাতের যুবক-

দের তুমি যা বোঝাতে চাইছ, বুঝিয়ে ফিরে এসো, আমি এখানেই থাকব।” এই কথার পর খড়্গবর্মা তীর ধনুক নিজের হাতে তুলে নিল। শত্রু কোন দিক দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করতে আসছে কিনা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল।

জীবদত্ত গাছ থেকে নেমে গণ্ডক-জাতের যুবকদের কাছে গিয়ে তাদের সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে দিল। মুহূর্তে এক গণ্ডক-যুবক গণ্ডারের পিঠে চড়ে নদীর তীরে গেল। কিন্তু বাকি তিনজন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বলল, “আজ্ঞে হুজুর, এই উটগুলোকে দেখে আমাদের কেমন

যেন ভয় করত। এখন দেখছি ঐ রাক্ষস-টাকে। সে কি আর আমাদের ঘাড় মটকাবে না?"

ঐ রাক্ষস এবং তার তান্ত্রিককে যা করার আমরা করছি। লুণ্ঠনকারীদের পেলেই মেরে ফেলবে। ওরা তোমাদের ক্ষেতের ফসল লুণ্ঠন করেছে। তোমরা খাবে কি? একথা তোমরা ভুলে যেয়ো না।" জীবদত্ত ওদের গুরুত্ব সহকারে স্মরণ করিয়ে দিল।

নিজেদের ক্ষেতের ফসল লুঠ করার কথা মনে পড়তেই যুবকরা বলল, "আমরা আর ছাড়ব না ঐ লুণ্ঠনকারী যুবকদের। আমরা যাচ্ছি!" বলে যুবকরা গণ্ডারের উপর চড়ে বজ্র কণ্ঠে বলল, "জয়, অরণ্যমাতার জয়! অরণ্য-মাতার জয়!" চীৎকার করে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল লুণ্ঠকারীদের উপর।

ঐ ভয়ঙ্কর রাক্ষসটার আক্রমণের ফলে যখন লুন্ঠকারীরা ছোটাছুটি কর-ছিল ঠিক তখনই গণ্ডক যুবকদের আবার গণ্ডারের পিঠে চড়ে আসতে দেখে লুন্ঠনকারীরা ভীষণ ভয় পেয়ে নেতাকে বলল, "প্রভু, গণ্ডকরা আক্রমণ করতে আসছে! এখন পালানো ছাড়া আর পথ নেই।" একথা বলে লুন্ঠকারীরা কেউ নদীর তীরের দিকে, কেউ গাছের দিকে ছুটে পালাল। একদিকে ভয়ঙ্কর রাক্ষসের আক্রমণ আর অন্য দিকে বল্লম উঁচিয়ে ছুটে আসা গণ্ডকদের আক্রমণ! লুন্ঠন নেতাও ভাবল, দুদিকের আক্রমণের মোকাবিলা করা সহজ নয়। তাই সে চিৎকার করে বলল, "তোমরা সবাই নদীর তীরের দিকে পালিয়ে যাও। ভুট্টার থলিগুলোকে আমাদের উদ্ধার করতেই হবে।" একথা বলে সেও সেখান থেকে হঠাৎ সরে পড়ল।

"উফ্! আমি দেরি করে ভীষণ বোকামী করেছি। সেই পাজী লোকটা প্রাণ নিয়ে পালাল।" এই কথা বলে গাছের ডালে বসে খড়্গবর্মা লুন্ঠন-

কারীদের নেতার উপর তীরের বৃষ্টি যেন বর্ষাতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে সে নিজের অনুচরদের নিয়ে নাগালের বাইরে, অনেক দূরে চলে গেল।

গণ্ডক জাতের যুবকরা তিন চার জন লুন্ঠনকারীকে বল্লম দিয়ে আক্রমণ করল। ততক্ষণে লুন্ঠনকারীরা তাদের নেতার ঘোষণা শুনতে পেয়ে পড়ি মরি করে পালাল।

গুহার ভেতর থেকে তান্ত্রিক বাইরে এল। মশাল তুলে ধরে নাড়তে নাড়তে বলল, "আরে এই ভূত, তুই কোথায় আছিস! ভুট্টার থলেগুলো কি হাতে পড়ল না ?"

সেই ভয়ঙ্কর লোমশ ভূত নদীর তীর থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে গুহার দিকে এগোল। পথে গণ্ডক-জাতের যুবকদের উপর নজর পড়তেই চীৎকার করে বলল, "এরা যে মহাকালের দূত-এক-সিংহধারী কালো বিরাট ভয়ঙ্কর মোষের উপর চড়ে একেবারে এসে পড়েছে!"

সেই চিৎকার কানে যেতেই তান্ত্রিক গুহা থেকে সোজা বেরিয়ে এল। মশালের আলোতে দেখতে পেল গণ্ডার এবং তার পিঠে চড়ে বসে-থাকা-লোকদের। দেখেই মুহূর্তকাল চমকে উঠল। কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে ভূতকে বল্ল, "ওরে এই জটাধারী ভূত! আরে এই লোকগুলো মহাকালের দূত নয়, ঐ এক-সিংহধারী মোষগুলো মোষ নয়। ওরা

গণ্ডক জাতের লোক। আরে ওগুলো গণ্ডার, বুঝলে গণ্ডার, সাধারণ জন্তু। তুমি ওদের আক্রমণ করে প্রথমে লোক-গুলোকে খেয়ে ফেলবে। তারপর ঐ জন্তুগুলোকেও খেতে পারবে।"

তান্ত্রিকের কথা শেষ হতে না হতেই লোমশ ভূত অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে চিৎকার করে বলে, "হেই, পালিও না! দাঁড়াও!" এই কথা বলেই গণ্ডক জাতের যুবকদের দিকে সে দুটো হাত ছড়িয়ে সশব্দে ধাবিত হল।

ঐ ভয়ঙ্কর রাক্ষসটাকে নিজেদের দিকে ছুটে আসতে দেখে গণ্ডক-যুবকরা আর্তনাদ করে উঠল, "হুজুর! আমরা মরে গেলাম!"

খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত প্রথম থেকেই বুঝতে পেরে ছিল যে গণ্ডক-যুবকরা আক্রান্ত হতে পারে। তাই তারা গাছ থেকে নেবে ওদের দিকে ছুটতে ছুটতে আসছিল! গণ্ডক-যুবকদের আর্তনাদ শুনেই খড়্গবর্মা লোমশ ভূতের দিকে তাক করে তীর ছুঁড়ল। কিন্তু তার শরীরে খাড়া খাড়া চুল থাকতে তীর তার গা বিদ্ধ করতে পারল না।

"গুরু! আমার দিকে কাঠের টুকরো একটা ছুঁড়েছে! লোমশ-ভূত বলল।

তান্ত্রিক বিস্মিত হল। এবারে সে দুহাতে দুটো মশাল তুলে ধরল। দেখতে পেল খড়্গবর্মা এবং জীবদত্তকে। ওরা তার দিকেই যাচ্ছে। তখন তান্ত্রিক চোখ লাল করে দাঁতে দাঁত পিষে চিৎকার করে বলল, "ওরে এই লোমশ-ভূত! তোর শরীরে যেগুলো বিদ্ধ হয়ে আছে সেগুলো কাঠের টুকরো নয়, তীর! তীর যে ছুঁড়েছে তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে ক্ষত্রিয়। আর তার সাথে যে আছে তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে আধা ক্ষত্রিয় এবং আধা তান্ত্রিক। দাঁড়া আমি আমার মন্ত্র-দণ্ড ছুঁড়ে ওদের দুজনকেই ভস্ম করে ফেলছি।" এ কথা বলেই তান্ত্রিক এক লাফে গুহার ভিতর ঢুকে গেল।

(চলবে)

চোরের সম্মান

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য ঐ গাছে উঠে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে অন্যান্য বারের মত মৌন ভাবে শ্মশানের দিকে হাঁটা দিল। তখন শব থেকে বেতাল বলল, "রাজা আমার সন্দেহ হচ্ছে একটা ব্যাপারে। আপনি সজ্জনদের জন্য পরিশ্রম করছেন না দুর্জনদের জন্য? চন্দ্রসেন রাজার মত কয়েক জন রাজা আছেন যাঁরা দুর্জনদের শাস্তি দেবার পরিবর্তে সম্মানিত করেন। উদাহরণ স্বরূপ আমি মহারাজা চন্দ্রসেনের কাহিনী বলছি, শুনলে পরিশ্রম কমবে, শুনুন।"

বেতাল বলল: কোন এক কালে চন্দ্রাবতী নগরে মহারাজা চন্দ্রসেন রাজত্ব করতেন। ঐ দেশে বহু কোটিপতি ব্যবসাদার থাকত কিন্তু দেশ সমৃদ্ধ ছিল না। বেশীর ভাগ মানুষ দরিদ্র ছিল। আসলে ঐ দেশের সমস্ত সম্পত্তি ব্যবসাদারদের

বেতাল কথা—৬

পরক্ষণেই সে যা পেত তাই গরীবদের মধ্যে ভাগ করে দিত। যাদের সাহায্য করত তারাও টের পেত না কে বা কারা সাহায্য করছে। ব্যবসাদাররা নিজেদের রক্ষা করতে পারল না। ঐ ডাকাতটাকে ধরার সমস্ত চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হল তখন তারা রাজার কাছে গিয়ে বলল, "রাজা ডাকাতটাকে না ধরে হাত গুটিয়ে বসে থাকা আপনার পক্ষে ভাল হচ্ছে না। আমাদের রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব।"

"আমি প্রহরীদের নিযুক্ত করেছি ঐ ডাকাতটাকে ধরতে। ডাকাতটা একদিন ধরা পড়বেই।" রাজা বলল।

কবলে ছিল। তাই রাজা ব্যবসাদারদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে ছিলেন। তাদের সুখ-সুবিধা দেখাশোনা করাই তাঁর প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য ছিল। ধনী আরও ধনী হত, গরীব আরও গরীব।

কিন্তু ওদের সামনে একটা সমস্যা দেখা দিল, একজন ডাকাতের উপদ্রব। আগে ভাগে জানিয়ে সে ডাকাতি করত। ঐ ডাকাতকে ধরা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার কারণ ও নিজের দলে অন্য কাউকে নেয়নি। তার ডাকাতির সময় তাকে কেউ চিনতে বা চেনাতে পারত না। এছাড়া ডাকাতি করার

"আপনার ঐ ডাকাত ধরার আগে আমরা সবাই ভিখারী হয়ে যাব। এখন আপনি ঘোষণা করিয়ে দিন : যে ধরবে তাকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে। ঐ ডাকাতের সাথী কেউ না কেউ ওকে ধরিয়ে দেবে।" ব্যবসাদাররা বলল।

রাজা ব্যবসাদারদের কথা মত ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করিয়ে দিলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। কেউ ডাকাত-টাকে ধরিয়ে দিল না। ডাকাত যথা-রীতি ডাকাতি করে যেতে লাগল।

ঐ ডাকাতের নাম গঙ্গাদাস। সে খুব গরীব লোক। ডাকাতি করা ছাড়া অন্য

কোন কাজ সে করত না। সে লক্ষ্য করল যে বিভিন্ন দক্ষ লোক বেকার হয়ে বসে আছে। কাজ পাচ্ছে না। না খেতে পেয়ে মরছে। তাই, সে আর কোন কাজ না পেয়ে চুরি করার কাজটাকেই বেছে নিল জীবিকা হিসেবে।

একদিন গঙ্গাদাস গভীর জঙ্গলের এক পাহাড়ী গ্রাম থেকে ফিরছিল। ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। তাড়াতাড়ি বাড়ি পেঁাছানোর উদ্দেশ্যে সে জোরে পা চালিয়ে হাঁটল। পথে সে ঐ ঘন বন থেকে মানুষের গোঙানী শুনতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা লোক পড়ে পড়ে গোঙাচ্ছে।

"কি হয়েছে ভাই, তুমি কে?" গঙ্গাদাস সেই লোকটাকে প্রশ্ন করল।

"আমার নাম রামদত্ত। আমি রাজ-গিরির নিবাসী। ব্যবসার কাজে আমি চন্দ্রাবতী নগরে যাচ্ছিলাম। পথে ভালুক আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আচ্ছা তুমি কে ভাই? এত রাত্রে, এখানে?" সেই ব্যবসাদার জিজ্ঞেস করল।

গঙ্গাদাস নিজের নাম বদলে বলল, "আমার নাম ধর্মদাস। আমি এক গরীব লোক।"

গঙ্গাদাস রামদত্তকে নিজের বাড়িতে তুলে আনল। তার শরীরে ওষুধ লাগিয়ে
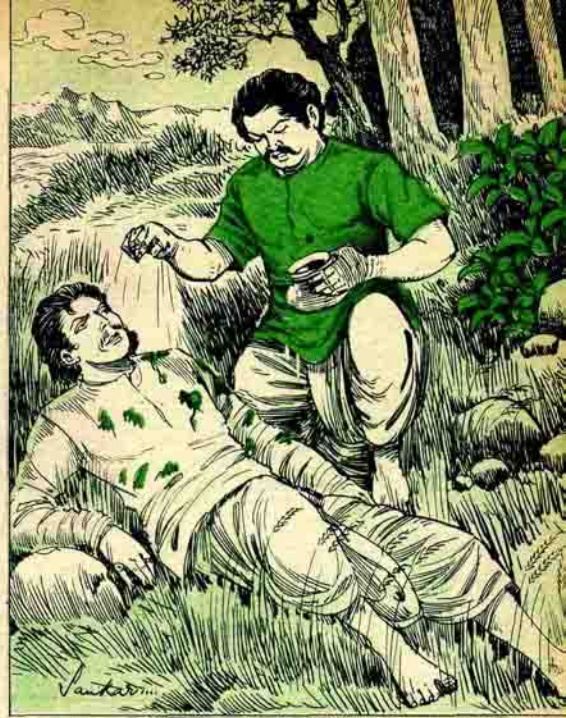
সেবা করতে লাগল গঙ্গাদাস।

রাত্রে গঙ্গাদাসকে যখন তখন বেরিয়ে যেতে দেখে রামদত্ত তাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি রাত্রে কোথায় যাও বলত?"

জবাবে গঙ্গাদাস অন্য কথা বুঝিয়ে বলে দিল। রামদত্তের ভাল ভাবে সেরে উঠতে অনেক দিন সময় লাগল। ইতি-মধ্যে দুজনের মধ্যে বেশ ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠল। রামদত্ত একদিন গঙ্গাদাসকে বিশেষ ভাবে প্রশ্ন করল, "তোমার এমন কি পেশা? কি ভাবে তোমার দিন চলে?

রামদত্তের উপর গঙ্গাদাসের বিশ্বাস জমে উঠে ছিল। তাই গঙ্গাদাস রাম-

দত্তকে নিজের সত্য কথা জানিয়ে দিল।

রামদত্ত যেদিন জানতে পারল যে গঙ্গা–দাসই ডাকাত সেদিন থেকে রামদত্তের প্রতি তার টান কমে যেতে লাগল। সে জানতে পেরেছিল যে গঙ্গাদাসকে যে ধরিয়ে দেবে তাকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে। রামদত্তের মনে দশ হাজার টাকার লোভ পেয়ে বসল। সে মনে মনে ভাবল ঐ দশ হাজার টাকা দিয়ে সে লক্ষ লক্ষ টাকা করতে পারবে।
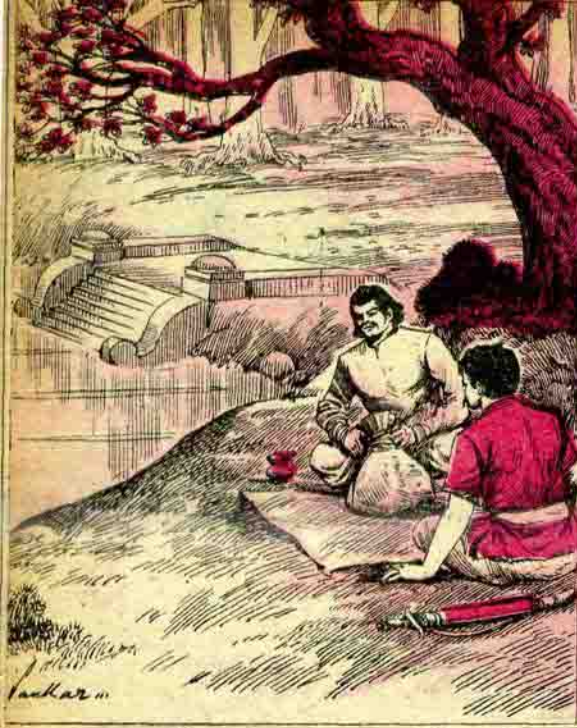
একদিন গঙ্গাদাস পাশের গ্রামে অন্য এক কাজে গেল। রামদত্ত ঐ ফাঁকে রাজার কাছে যে সে গঙ্গাদাসকে ধরিয়ে দেবে তাকে যেন দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়!

"কোন এক অজুহাতে ডাকাতকে কাল দুপুরে রাজপ্রাসাদের কাছে নিয়ে এস। আমার প্রহরী তাকে ধরে ফেলবে!" রাজা বললেন।

রামদত্তের আনন্দ আর ধরে না। সে আবার গঙ্গাদাসের বাড়িতে এল। সে গঙ্গাদাসকে বলল, "ভাই গঙ্গাদাস, আমি আজ পর্যন্ত কোনদিন শহর দেখিনি। কালকে তুমি আমাকে সারা শহর দেখাবে?" গঙ্গাদাস রাজী হল। কারণ রামদত্তকে সে সন্দেহ করেনি।

দুজনে খাবার দাবার বেঁধে পরের দিন সকালে শহর দেখতে চলল। দুপুরের সময় ওরা রাজপ্রাসাদের কাছে গেল। সেখানকার এক পুকুরের পাশে, গাছের নীচে বসে খাবার খেতে বসল।

ঠিক তখনই কোত্থেকে এক কুকুর তাদের কাছে এল। রামদত্ত সেই কুকুরটাকে তাড়া করল কিন্তু গঙ্গাদাস কুকুরটাকে একটু খাবার খেতে দিল।

খাবার খাওয়ার পর রামদত্ত গঙ্গা–দাসকে বলল, "চল, রাজপ্রাসাদের কাছে আমাকে ঘুরিয়ে আনবে।"

কুকুরটাও গঙ্গাদাসের পিছনে চলল। ওরা দুজনে রাজপ্রাসাদের সামনে পৌঁছাল। রামদত্ত প্রাসাদের সামনের

প্রহরীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু ওরা গঙ্গাদাসকে ধরার কোন রকম চেষ্টা করল না।

তখন অগত্যা রামদত্ত চিৎকার করে বলল, "এখন তুমি আমার কবলে। এখন পালাবে কি করে।"

রামদত্তের বিশ্বাসঘাতকতা দেখে গঙ্গা-দাসের রক্ত মাথায় উঠে গেল। সে তৎক্ষণাৎ রামদত্তকে মারার জন্য কমর থেকে ছোরা বের করল। কিন্ত আগে থেকেই রামদত্ত প্রস্তুত থাকায় সেই আগে ছোরা ছুঁড়ে মারল। হঠাৎ সেই কুকুর ছোরার সামনে লাফিয়ে পড়ল। ছোরা কুকুরের গায়ে বিদ্ধ হল। কুকুর তক্ষুণি মারা গেল।

পরক্ষণেই গঙ্গাদাস নিজের তরবারি বের করে রামদত্তের মাথায় আঘাত করল। তখন প্রহরীরা এগিয়ে গিয়ে গঙ্গাদাসকে ধরে ফেলল।

গঙ্গাদাস রামদত্তের মৃত দেহের উপর লাথি মেরে বলল, "পাজী বদমাইস! তোর চেয়ে এই রাস্তার কুকুরটা ঢের ভাল।" প্রহরী গঙ্গাদাসকে রাজার সামনে হাজির করল। রাজা গঙ্গাদাসের সাথে অনেকক্ষণ গোপনে আলোচনা করলেন।

পরের দিন দেশের সমস্ত বড় বড় নামকরা ব্যবসাদারদের ডেকে পাঠালেন। সবার সামনে গঙ্গাদাসকে হাজির করে রাজা বললেন, "এই গরীব লোকটা আমাদের দেশের বিরাট উপকার করেছেন। এর পর আর কোন চুরি ডাকাতি হবে না। প্রত্যেকে দশ দশ হাজার করে এই লোকটাকে দিলেও এর উপকারের ঋণ শোধ হবে না।"
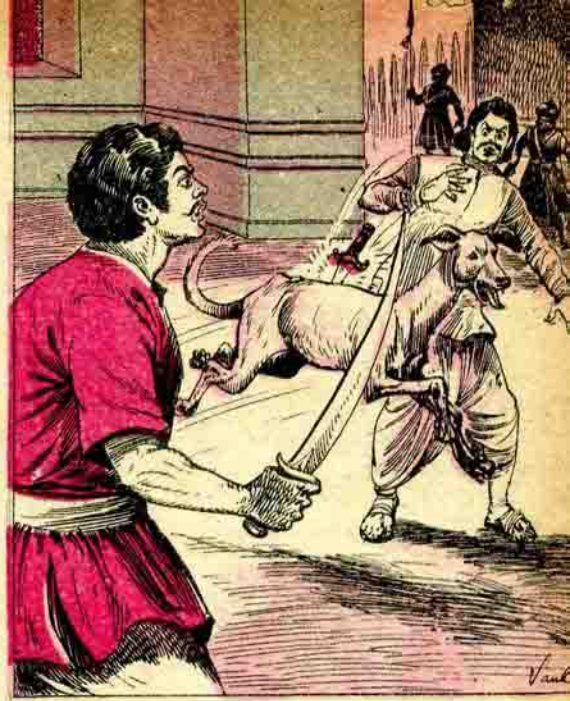
ব্যবসাদাররা রাজার কথামত গঙ্গা-দাসকে পুরস্কৃত করল। তারপর গঙ্গাদাস রাজার পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত হল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, মহারাজ চন্দ্রসেনের এই ধরণের ব্যবহারের কারণ কি? তাঁর প্রহরীরা গঙ্গাদাসকে দেখার সাথে সাথে ধরল না

কেন ? ডাকাতের ধরা পড়ার পর তাকে শাস্তি না দিয়ে ব্যবসাদারদের দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করালেন কেন ? তাকে নিজের পরামর্শদাতা নিযুক্ত করালেন কেন ? গঙ্গাদাস কি রাজাকে বলে ছিল যে সেই ডাকাতটাকে মেরে ফেলেছে ? তার আগের দিন রাজা রামদত্তকে দেখে ছিলেন না ? রাজা কি গঙ্গাদাসকেই রামদত্ত ভেবে ছিলেন ? এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দেন তো মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

তারপর বিক্রমাদিত্য বলল, "ঐ ডাকাতের জন্য রাজার কোন ক্ষতি হচ্ছিল বলে তো আমার মনে হচ্ছে না। রাজা ছিলেন ব্যবসাদারদের হাতের পুতুল। ব্যবসাদারদের ক্ষতির ফলে রাজার কোন দুঃখ ছিল না। তাই ডাকাতটাকে ধরার ব্যাপারে রাজা হয়ত তত ব্যস্ত ছিলেন না। উলটে রাজা যখন গরীবদের উপকার করতে পারছিলেন না তখন ঐ ডাকাতই উপকার করছিল। এই ভাবে হয়ত ডাকাতটা রাজার ইচ্ছাই পূরণ করছিল। ডাকাতটাকে ধরানোর জন্যে যে লোকটা এগিয়ে এল সে বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছু নয়। তাই বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি রাজা ডাকাতকে দিয়েই দাওয়ালেন। গঙ্গাদাস রাজাকে হয়ত সমস্ত সত্য কথাই জানিয়েছে। মিথ্যা কথা বলে দশ হাজার টাকা রোজগার করার লোভ গঙ্গাদাসের মনে ছিল না। তাই রাজা তাকে শাস্তি দিলেন না। রাজা জানতেন যে ব্যবসাদারদের কাছ থেকে গঙ্গাদাসকে যে পুরস্কার পাইয়ে দিয়েছেন তা গরীবদের হাতেই পৌঁছে যাবে। তাকে পরামর্শ-দাতার পদে নিযুক্ত করার পেছনেও কারণ ছিল! রাজা হয়ত তার মাধ্যমে ব্যবসাদারদের রহস্য জেনে তাদের হাত থেকে নিজেকে ক্রমশ মুক্ত করতে চেয়েছেন।"

রাজার মুখ খোলার সাথে সাথে মৌন ভাব ভঙ্গ হল। তৎক্ষণাৎ বেতাল শব নিয়ে উঠে বসল সেই গাছে। [কল্পিত]
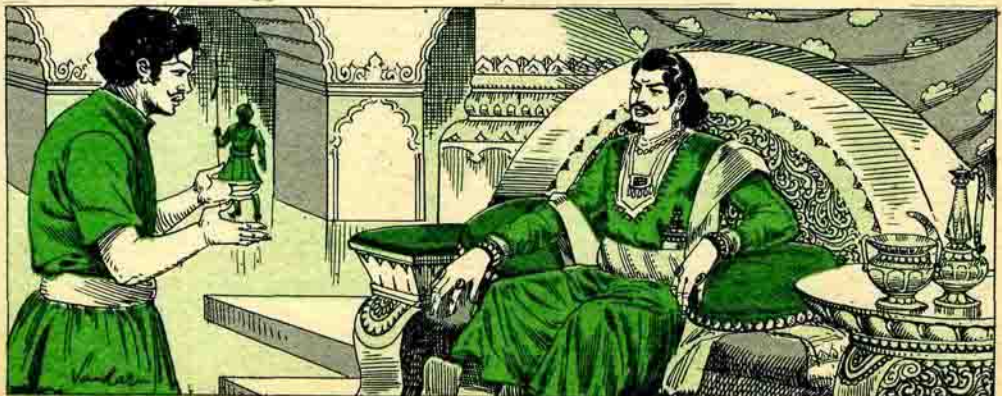
ধনীর কাছে শেখা

এক গ্রামে এক ধনী ছিল। তার কাছে চারটে গরু ছিল। সেই গরুগুলোকে দেখাশোনার জন্য এক গরীব কিষাণ ছিল। ধনী লোকটার ইচ্ছা করল গাঁয়ের লোকের কাছে উদার ব্যক্তি হিসেবে নাম করার। তার জন্য সে এক উপায় উদ্ভাবন করল। সে তার দুজন চাকরকে বলল যে কিষাণ যখন গরু চরাতে যাবে তখন যেন তারা একটা একটা করে তিনটে গরু চুরি করে। ওরা তাই করতে রাজী হল।

গরীব কিষাণ গরু চরাতে গিয়ে একটা হারিয়ে এসে ধনীকে জানাল। ধনী বলল, "আরে তাতে তুমি আর কি করবে? তোমার অত ভাবনার কি আছে? যাক, যা গেছে যাক।" গরীব কিষাণ বেচারা ধনীর ব্যবহারে বিস্মিত হল। গাঁয়ের লোক ধনী লোকটার উদারতার পরিচয় পেয়ে তার তারিফ করল।

এই ঘটনার পরের দিন আবার একটি এবং তৃতীয় দিন আর একটি গরু চুরি হয়ে গেল। তখনও ধনী লোকটা কিষাণকে কোন কথা বলল না। তারপর ধনী লোকটার উদারতার কথা চারদিকের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল।

শেষে একদিন কিষাণ ক্ষেত থেকে একা ফিরে ধনীকে জানাল যে চতুর্থ গরুটাও হারিয়ে গেছে। তারপর সে কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেল।

ধনী কিছুতেই ভেবে পেল না চতুর্থ গরুটাকে কে চুরি করল! তিনটি গরু চুরি করানোর পর সে আর কাউকে তার গরু চুরি করতে বলে নি। ধনী লোকটা জানত না যে চতুর্থ গরুটা চুরি করেছে তার গরীব কিষাণ চাকর। —বারীন ঘোষ
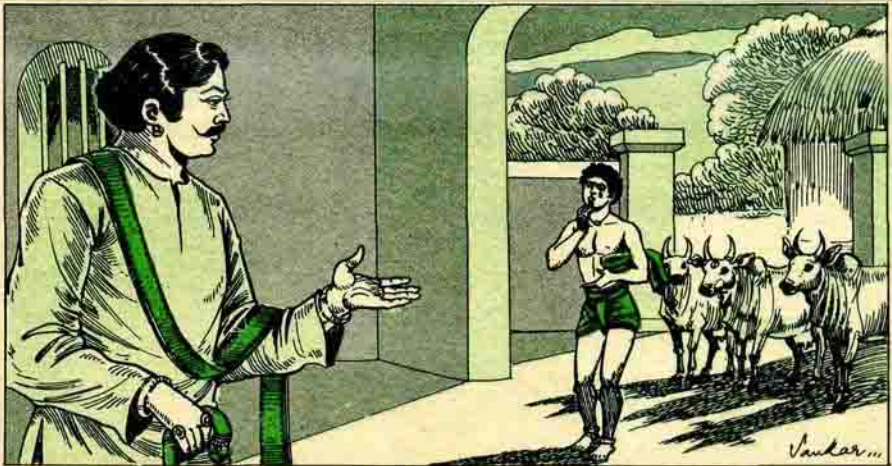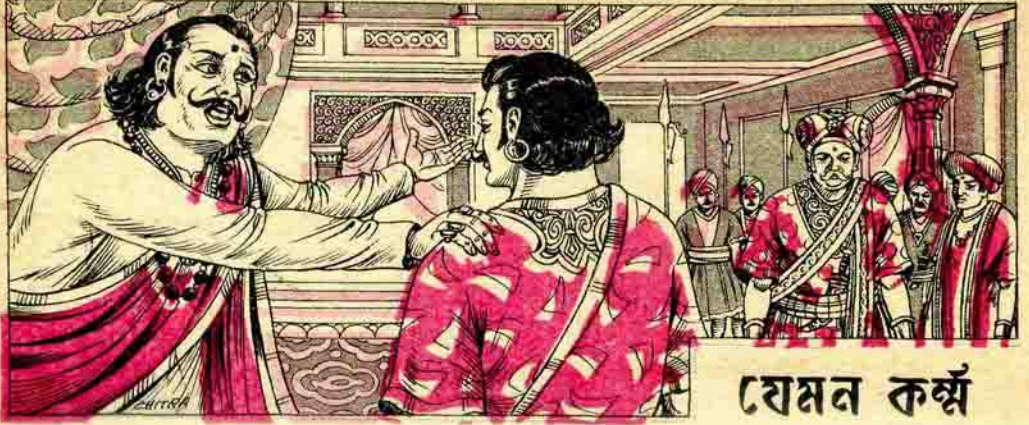
যেমন কর্ম্ম

এক সময়ে পাঞ্চাল দেশে বিজয় সিংহ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। সেই রাজা খুব দয়ালু ছিলেন। এই জন্য লোকে তাঁর রাজ্যকে রামরাজ্য বলত। কিন্তু সেই রাজার কোন সন্তান ছিল না। তাই রাজা বিজয় সিংহ স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থস্থান ভ্রমণের কথা ভাবলেন। নিজের ভাবনার কথা ছোট ভাই জয়সিংহকে জানালেন। তার হাতেই রাজ্য-ভার দিয়ে চলে গেলেন তীর্থ যাত্রায়।

জয় সিংহ প্রথম থেকেই ভোগ লালসায় ডুবে ছিল। ভাই তাকে রাজ্যের ভার দেবার পর রাজা হওয়ার আনন্দের স্বাদ আরও বেশি করে সে পেল। যোগ্য মন্ত্রী ছিল। শত্রুর হাত থেকে রাজ্য রক্ষার জন্য ভাল সেনাপতি ছিল। রাজ্যকে আর দেখার কি আছে।

আনন্দের মাঝে মাঝে যখন জয় সিংহের মনে হত যে এই সব আবার দাদার হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে তখন তার ভীষণ খারাপ লাগত। এতদিন তার মনে একটা আশা ছিল! দাদার তো ছেলে নেই। তাই দাদা মারা যাবার পর গোটা রাজ্যের রাজা সেই হবে। দাদার ফিরতে অনেক দেরি হওয়ায় সে তাঁর খোঁজ নিল। দাদা কোথায় আছে? কেমন আছে?

জয় সিংহ খবর পেল যে বিজয় সিংহ তীর্থ ভ্রমণ শেষ করে দিন কয়েকের মধ্যেই ফিরে আসছেন। রাজধানীর অনেকেই এই খবর গোপনে গোপনে পেয়ে মনে মনে ভীষণ খুশী হল। কিন্তু জয় সিংহ মনে মনে কাঁদছে। কিন্তু বাইরে এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সেও দাদার ফিরে আসার খবর পেয়ে আনন্দিত।

একদিন রাত্রে জয় সিংহ নিজের এক

জীবন গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্বাসী পাত্রকে নিয়ে গোপনে পরামর্শ করল। ঠিক করল ওর দাদা আর বৌদিকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করানো হবে। জয় সিংহের কথাবার্তা আড়ি পেতে তার স্ত্রী রূপমতী শুনল।

পরের দিন রাজধানীতে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে বিজয় সিংহ এবং তার স্ত্রী আততায়ীর আঘাতে মারা গেছেন। সমগ্র রাজ্যে খবরটা বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ল। যারাই শুনল তারাই দুঃখিত হল। জয় সিংহের মনে দুঃখ হতে লাগল। কারণ দাদার প্রতি যথেষ্ট টান থাকা সত্ত্বেও শুধু রাজ্য পাওয়ার আশাতেই সে তাঁদের হত্যা করাল।

কিন্তু সব যখন পাওয়া গেল তখনই জয় সিংহের মন থেকে যেন সব হারিয়ে গেল। তার যেন কিচ্ছু ভাল লাগেনা। দেশের মানুষের অনেক অভাব। অনেক দায়িত্ব। অনেক কাজ। এই কাজ করতে করতে আনন্দ করার আর সময় পায় না। তখন চেষ্টা করল দাদার মত জনহিতকর কাজ করে প্রশংসা পেতে চাইল সে দেশবাসীর। ক্রমে ক্রমে প্রজাদের মুখে মুখে তার প্রশংসা ছাড়িয়ে পড়ল।

জয় সিংহের সিংহাসনে বসার পর তার স্ত্রী রূপমতী গর্ভবতী হল। সিংহাসনে বসার পরেই জয় সিংহকে আশে পাশের অনেক রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হল। কারণ বিজয় সিংহের মারা
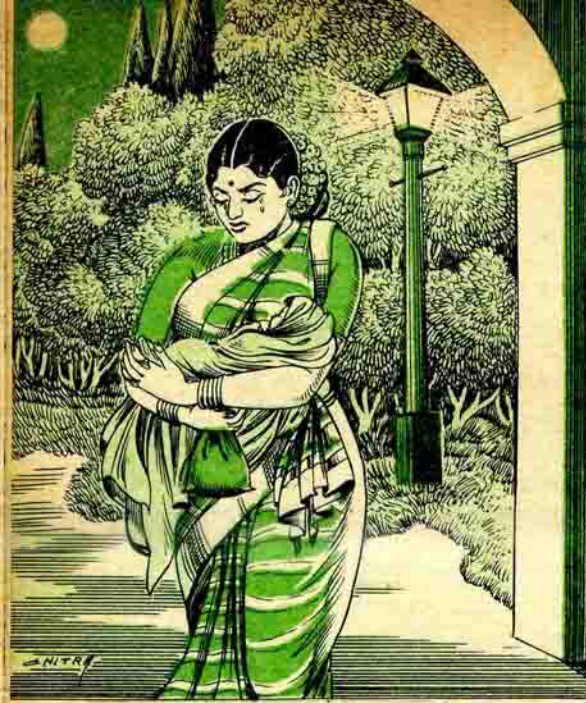
যাবার পর ঐ রাজারা ভেবেছিল যে পাঞ্চাল দেশ দুর্বল হয়ে গেছে।

জয় সিংহের যুদ্ধ যাত্রা করার কিছু-দিনের মধ্যেই রূপমতীর যমজ পুত্র হল। সদ্যজাত শিশুদের দেখে রূপমতীর একা-ধারে আনন্দ এবং বেদনা দুটোই হল। তার মনে হল যতই স্নেহ প্রীতির সম্পর্ক থাক না কেন বড় হয়ে তো দুই ভাইয়ের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে অশান্তি হবে। হয়ত একে অন্যকে হত্যাও করে বসবে। কারণ সে তো জানত তার স্বামী জয় সিংহ কেমন ষড়যন্ত্র করে নিজের দাদা-বৌদিকে হত্যা করিয়েছে। অথচ দুই ভাইয়ের মধ্যে কত টান ছিল। তার থেকেই বুঝতে পারল সিংহাসন পাওয়ার লোভ মানুষকে দিশেহারা করে ফেলে।

সেইজন্য রূপমতী নিজের দাই মাধবীকে বলল, "মাধবী আমার একটা উপকার করতে হবে। আমার দুটো ছেলের দরকার নেই। এদের মধ্যে একজনকে বনে কোথাও ফেলে এসো। আর ফেলে আসা বাচ্চার সাথে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার থলিও একই জায়গায় ফেলে এসো। কেউ এই স্বর্ণমুদ্রার থলি ও শিশুকে একসাথে পেয়ে তাকে পুষবে।"

প্রথমে মাধবী একাজ করতে রাজী হয়নি। তখন রাণী রূপমতী সিংহাসন লাভের জন্য তার স্বামী কি করেছে তা জানাল। সব শুনে মাধবী ঐ দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং রূপমতীর শিশুপুত্রকে নিয়ে চলে গেল। যা করল তা নিয়ে রূপমতীর অনুশোচনা হল না কিন্তু দুঃখ হল।

এত যে কাণ্ড আঁতুড় ঘরে হয়ে গেল তা মাধবী ছাড়া অন্তঃপুরের আর কেউ জানত না। সবাই জানল রূপমতীর একটাই ছেলে হয়েছে। শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করে জয় সিংহ রাজপ্রাসাদে ফিরে পুত্র সন্তান হওয়ার সংবাদ পেয়ে আনন্দিত হল। তার নাম রাখা হল জয়চন্দ্র।

ওদিকে দাই মাধবী রূপমতীর শিশু-

সন্তানকে জঙ্গলে ফেলে না দিয়ে নিজের কাছেই রেখে লালন পালন করতে লাগল। মাধবী তার নাম রাখল মধু।

রাজপ্রাসাদে জয়চন্দ্র বাড়তে লাগল। কিন্তু রূপমতী মাঝে মাঝে তার অন্য পুত্র-সন্তানের কথা ভীষণ ভাবে ভাবত।

সময় অতিবাহিত হতে থাকে। জয়-চন্দ্র সমস্ত রকমের অস্ত্র চালনায় নিপুণ হয়ে উঠল। এখন সে যুবক। রাজা জয় সিংহ এক বিজয়া দশমীর দিন সমস্ত রকমের অস্ত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করল। রাজা ঘোষণা করেছিল : যুবরাজকে যে যুবক অস্ত্র চালনায় হারিয়ে দেবে তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে। এই প্রদর্শনী দেখার জন্য দূর দূর থেকে লোক আসতে লাগল। অনেকে আবার জয়চন্দ্রের সাথে অস্ত্র চালনা করে নাম করতে এল। কিন্তু সবাই হেরে গেল।

অবশেষে যুবরাজ জয়চন্দ্র ভীড় দেখে দর্পের সাথে বলল, "আমার সাথে অস্ত্র চালনা করতে আর কি কেউ নেই ?"

তখন ভীড়ের ভেতর থেকে মধু এগিয়ে এল। দুজনে তরবারি যুদ্ধে লিপ্ত হল। দর্শকরা ঐ দুজনের চেহারার ভীষণ মিল দেখে অবাক হল। জয়সিংহ এবং রূপমতীও বিস্মিত হল।

রাজা জয়সিংহ এই অদ্ভুত মিলের কারণ জানার জন্য তরবারি যুদ্ধ থামিয়ে দিল। পরক্ষণে মধুকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কার ছেলে ? তোমার নাম
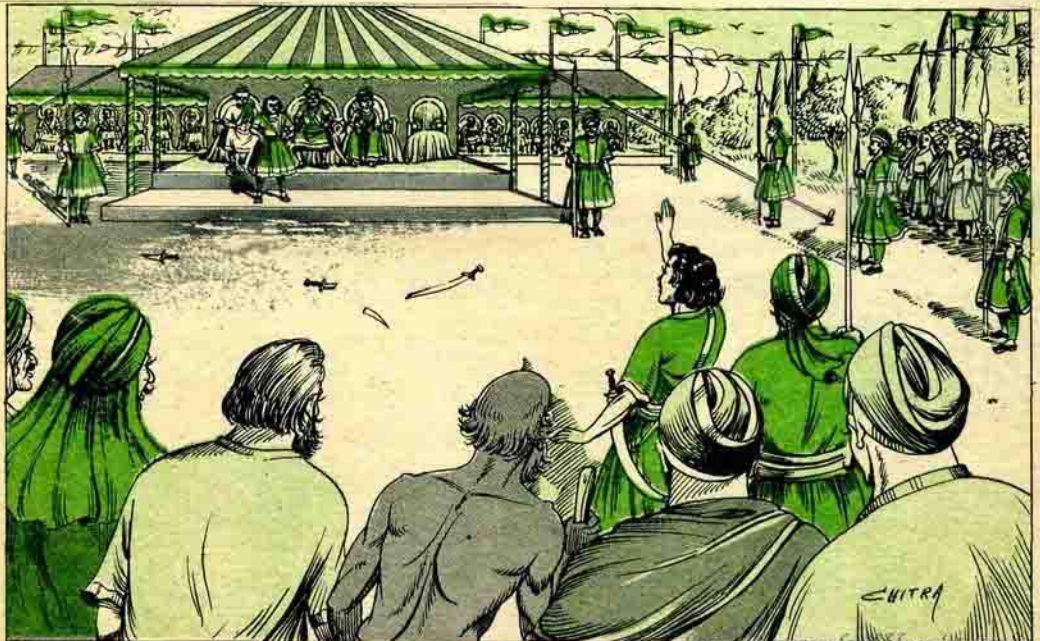
কি ?" এ প্রশ্ন শুনে মধু হেসে বলল, "মহারাজ ! প্রজা মাত্রেই আপনার সন্তানতুল্য। তাই, আমাকেও আপনি আপনার সন্তানই মনে করুন না কেন ?"

এ কথা শুনেই রূপমতী অজ্ঞান হয়ে যায়। রাজা রাণীকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে তার জ্ঞান ফেরালেন।

রূপমতীর জ্ঞান হওয়ার পরই সে মধুকে এবং মাধবীকে কাছে দেখে দু হাত বাড়িয়ে আর্তনাদ করে ওঠে, "আমার খোকা !" মাধবী মধুকে রাণীর দিকে ঠেলে দিল।

রাজা ভাবল তার স্ত্রীর মতিভ্রম হয়েছে। বলল, "এসব তুমি কি করছ ?"

"মহারাজ আমার যমজ পুত্র হয়েছিল। জয়চন্দ্র আর এই ছেলেটা। আমার ভীষণ ভয় করছিল একটা কথা ভেবে। আমি ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম যে এরা বড় হলে সিংহাসন নিয়ে খুনোখুনী করবে। তাই একটা শিশুকে আমি জঙ্গলে ছেড়ে আসতে মাধবীকে দিয়েছিলাম। আমার হারানো মানিক এতদিনে আমার কোলে ফিরে এসেছে।" রূপমতী বুঝিয়ে বলল।

তারপর মাধবী রাজাকে জানালো কেমন করে সে তার শিশু সন্তানকে জঙ্গলে ফেলে না দিয়ে পুষেছ।

জয় সিংহের মনে পড়ল কেমন করে সে নিজের ভাইকে হত্যা করেছে। তাই সে রূপমতীকে বলল, "রাণী, সিংহাসনের জন্য আর এই পরিবারে কোনদিন খুন হবে না। আমি এই রাজ্যকে নিজের দুই ছেলের মধ্যে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দেব।" এই কথা রাজা এমনভাবে বলল যেন শপথ করছে।

রাজার এই ঘোষণা শুনে রূপমতীর মন আনন্দে ভরে গেল। সে নিজের দুই ছেলেকে একসাথে দেখে ভীষণ আনন্দিত হল। জয়সিংহ নিজের জীবদ্দশায় নিজের রাজ্যকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে রাজ্যাভিষেক করাল।

সাবধানী

এক গ্রামে গোকুলদাস নামে এক গরীব লোক ছিল। অধিক বয়সে তার এক সন্তান হয়। তার নাম রামদাস রাখা হল। রামদাসের বয়স যখন বার তখন গোকুলদাস বুড়ো হয়ে যায়। তার মাথার উপর একশো টাকার ধারের বোঝা ছিল।

রামদাস বাবাকে বলল, "বাবা, তুমি আর কাজ করো না। এবার থেকে আমি রোজগ্গার করব।" এই কথা বলে রামদাস গ্রামান্তরে গেল। যে-কাজ পায় সেই কাজ করেই সে রোজগার করে।

রামদাসকে এক বুড়ী নিজের বাড়িতে থাকতে দিল। রামদাস তার বিশ্বাস ভাজন হয়ে ওঠে। বুড়ী তাকে নিজের ছেলের মত ভাল বাসত।

একবার বুড়ী রামদাসকে বলল, "বাবা, তুমি সবাইকে বিশ্বাস করো না। নতুন লোককে তিনবার পরীক্ষা করে তবেই তাকে বিশ্বাস করবে। আমিও তোমাকে তিনবার পরীক্ষা নিয়েই বিশ্বাস করে ছিলাম। বিষয় সম্পত্তি আর ধনের ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত।"

রামদাস চাকরি করে যা রোজগার করত তা এক মাটির পাত্রে রেখে চালে গুঁজে দিত। যখন তখন ঐ পাত্র বের করে টাকা পয়সা গুনে আবার তা চালে গুঁজে রাখত।

একবার বুড়ি মেয়ের বাড়ি গেল। বাড়িতে রামদাস একলা ছিল। সে মাটির পাত্রের পয়সা গুনে খেতে যাবে এমন সময় এক জনের ডাক শুনতে পেল। "বাবা, আমি ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাচ্ছি। আমাকে খেতে দাও।" রামদাস ঐ ভিখারীকে খেতে দিল।

ভিখারী রামদাসকে বলল, "আমি বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভিক্ষে করি। আমি

গোপাল চৌধুরী

এখন কোথায় যাব। রাত হয়ে গেছে। একটু এই বারান্দায় বিশ্রাম করে নি। কাল সকালেই চলে যাব।"

রামদাস ভিখারীকে বারান্দায় ঘুমোতে দিল। হঠাৎ তার মনে পড়ল বুড়ীর সাবধান বাণী। নতুন লোককে তিনবার পরীক্ষা করে তবে বিশ্বাস করা উচিত। টাকা পয়সার ব্যাপারে কাউকে একেবারে বিশ্বাস করা উচিত নয়। ভিখারী তো একেবারে নতুন লোক।

রামদাস পয়সার পাত্র রান্না ঘরে লুকিয়ে রাখল। রান্না ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরে শুলো। বাইরের বারান্দায় শোয়া লোকটা সত্যি সত্যি চোর ছিল। ওর হাতের পোঁটলাতে সোনা দানা ছিল। রামদাসের পয়সা গোনা এবং রাখা চোর লক্ষ্য করল।

মধ্যরাত্রে চোর উঠল। ঘরের পিছনে গিয়ে রান্না ঘরের দেয়ালে সিঁদ কাটল। ভেতরে ঢুকল। ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই লঙ্কা পোড়ার ঝাঁজ লেগে গেল। কাশতে লাগল ঐ চোর। রামদাস ঘুমোনোর আগে উনুনে শুকনো লঙ্কা প্রভৃতি দিয়ে রেখে ছিল। রান্না ঘরের দরজা জানালা বন্ধ থাকায় রান্না ঘর ভর্ত্তি ধোঁয়া ছিল।

চোরের কাশি শুনে রামদাস তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে ঢুকল। সিঁদ কাটা জায়গা দিয়ে চোর ঢুকছিল। তার পা ধরে সোজা ভেতরে টেনে নিয়ে গেল। তাকে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রেখে পাড়ার লোককে ডাকতে গেল।

তারপর পাড়ার লোক জড় হয়ে গাঁয়ের মাতব্বরের কাছে নিয়ে গেল ঐ চোরটাকে। চোরের পোঁটলা থেকে বেরুলো গাঁয়ের বহু লোকের সোনাদানা। গাঁয়ের লোক যার যা গয়না নিয়ে রামদাসকে যথাসাধ্য পুরস্কৃত করল। ঐ পুরস্কার এবং নিজের রোজগার একত্র করে বাবার ধার শোধ করল। নিজের বাকি জীবন সে ন্যায়ের পথে সততার সাথে কাজ করে কাটাল।

এক দিনের রাজা

তিন

আবুল হোসেনের এখন পূর্ণ বিশ্বাস হল যে সে সত্যি খলিফা। তার ভোজন শালায় নানান রঙের আলোর বাহার। সোনার মনোরম পর্দার শোভা। সব মিলিয়ে সে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। ঘরের মাঝে সাতটা সোনার থালায় মাংসসহ সাত রকমের খাবার সাজানো রয়েছে। তার আশে পাশে সাত রমণী হাত পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সারা ঘর ধূপের সুগন্ধে ভরপুর ছিল।

আবুল কাল দুপুরের পর আর কিছু খায় নি। তাই তার ভীষণ খিদে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি গিয়ে থালার সামনে বসে পড়ল। তৎক্ষণাৎ সাতজন যুবতী পাখা নাড়তে লাগল। আবুল খাবার সময় অত হাওয়া খেতে অভ্যস্ত ছিল না। সে শুধু একজন নিগ্রো যুবতীকে পাখা নাড়তে বলে বাকি সবাইকে তার সামনে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বসতে বলল। তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে খেতে লাগল।

খাবার পর হিজড়েরা এসে তার হাত ধুয়ে দিল। তাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখাল। সেই ঘর আরও সুন্দর আরও আকর্ষণীয়। সেই ঘরে সাত রকমের ফল সাজানো ছিল। সাত-জন সুন্দরী ছিল অপেক্ষায়। আবুল সমস্ত রকমের ফল চেখে দেখে অন্য ঘরের দিকে পা বাড়াল।

সেই ঘরে সুন্দর সুন্দর রকমারী বোতলে এবং সোনার পাত্রে নানান ধরণের পানীয় ছিল। সেই পানীয় আবুলের হাতে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সুন্দরী রমণীরা অপেক্ষা করছিল। আবুল ঐ যুবতীদের তার চারদিকে

ঘিরে বসতে বলে ওদের হাত থেকে পানীয় নিয়ে পান করছিল। ওদের মধ্যে একজন যুবতী বেশী নেশার ওষুধ মেশানো পানীয় আবুল হোসেনকে পান করতে দিল। সেটা পান করে আবুল বেহুঁস হয়ে গেল।

এতক্ষণ পর্দার অন্তরালে থেকে আবুল হোসেনের কাণ্ডকারখানা খালিফা দেখছিলেন এখন তিনি বেরিয়ে এলেন। হারুণ-অল-রশীদ গোলামকে ডেকে আবুলের গা থেকে রাজার পোষাক খুলে আবুলের নিজের পোষাক পরাতে বললেন। তারপর যে গোলাম আগের দিন আবুল হোসেনকে তুলে রাজপ্রাসাদে এনেছিল তাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "একে তার ঘরে শুইয়ে দিয়ে ফিরে এস।" গোলাম রাজার নির্দ্দেশ পালন করতে চলে গেল। এবার গোলাম দরজা বন্ধ করার কথা ভোলেনি। দরজা বন্ধ করেই সে রাজার কাছে ফিরল।

পরের দিন দুপুর পর্যন্ত আবুল হোসেন বেহুঁস হয়ে ঘুমোচ্ছিল। দুপুরে তার নেশা কাটল। চোখ বুজেই আগের দিন ভোরে যাদের যাদের ডেকেছিল তাদের সবাইকে নাম ধরে ডাকল। কিন্তু কেউ না আসাতে ভীষণ ভাবে চটে গিয়ে উঠে বসল বিছানার উপর।

তখন তার খেয়াল হল সেতো প্রাসাদে নেই, ঘরে নিজের বিছানাতেই পড়ে আছে।

তারপর ভাবল সে হয়ত স্বপ্ন দেখছে।

সে ডাক দিল, "জাফর ! জাফর ! মনশুর ! তোমরা কোথায় ?"

তখন তার মা ছুটে এল। প্রশ্ন করল, "কি রে আবুল, বাবা, কি হয়েছে ! স্বপ্ন দেখছিস না কি ! চেঁচাচ্ছিস কেন ?"

"আরে এই বুড়ী, তুমি কে ? আর এই আবুলটাইবা কে ?" সে জিজ্ঞেস করল।

"ওরে, আবুল, তুই তো আবুল হোসেন, আমি আমিতো তোর মা ! আমাকে চিনতে পারছিস না কেন ?" বলল আবুলের মা।

"আরে এই বুড়ী, তুমি জান, তুমি কার সাথে কথা বলছ ? আমি খলিফা হারুণ-অল-রশীদ ! এই মর্তভূমিতে আল্লার প্রতিনিধি ! যাও, ভাগো এখান থেকে।" আবুল বকল মাকে।

তার মা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "কিরে ! তোর হোল কি ! আজেবাজে কথা বলছিস কেন ? এভাবে চেঁচালে আশ-পাশের লোক জমে যাবে। আমার সর্বনাশ হল। দোহাই বাবা, চুপ কর।... তুই হারুণ-অল-রশীদ হতে যাবি কেন ? কি সর্বনেশে কথা। এসব কথা বাদশাহের কানে গেলে আর রক্ষে থাকবে না।" বুড়ী বলল।

"আমি হারুণ-অল-রশীদ ! আমি পৃথিবীর অধিপতি।" আবুল বলল।

আবুলের মা বুক চাপড়ে বলল, "বাবা, তোর মাথায় ভুত চেপেছে। তোর মাথাই
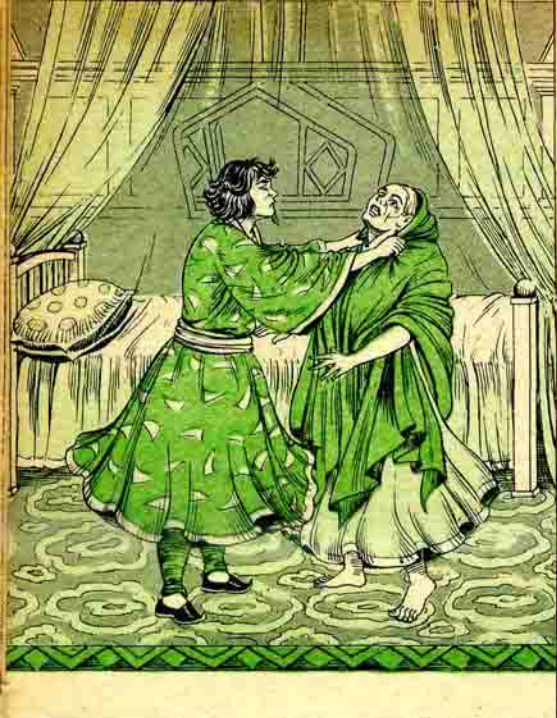
খারাপ হয়ে গেছে। তুইতো জন্ম থেকে আমার কাছেই আছিস! আমি তোকে এত বড় করেছি। একটু জল খা বাবা। চোখে মুখে জলের ছিটে দে। ঘুমের ঘোর কেটে যাবে।"

বুড়ীর হাত থেকে জল নিয়ে পান করে বলল, "হয়ত সত্যি আমি আবুল হোসেন! এইতো আমার ঘর! তুমিতো আমার মা! আমাকে কেউ জাদু করেছে।"

আবুলের মা রান্না করতে যাওয়ার আগে ছেলেকে জিজ্ঞেস করল সে কি স্বপ্ন দেখেছে? তৎক্ষণাৎ আবুল বিছানা থেকে ঝাঁপ দিয়ে তার মার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "পাজি মহিলা তুমি আমার কাছে বলছ না কেন, কারা আমার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে! কারা আমাকে এই অন্ধকার নোঙরা ঘরে ফেলে গেছে! বল, বল তাড়াতাড়ি, না হলে তোমাকে জানে মেরে ফেলব। যতদিন না আমি সিংহাসন ফিরে পাচ্ছি ততদিন আমার রাগ কমবে না! সাবধান! রাজার রাগের অর্থ যে কি তা তুমি বোঝ না! এই ষড়যন্ত্র যে করেছে তার রেহাই নেই! আমি কোন দিন তাকে ক্ষমা করব না।" আবুল তার মাকে ছেড়ে দিল। পরে তার মা গোলাপ জল দিয়ে সরবৎ করে এনে খেতে দেয় তাকে।

আবুলের মা ছেলের মন অন্য দিকে ফেরানোর জন্য বলল, "জানিস বাবা আবুল, কাল ভারি মজার একটা ঘটনা ঘটেছে এখানে। তুই শুনে খুব খুশী হবি। কাল আমাদের এই মল্লোর মোড়লকে, ওর দুজন অনুচরকে, রাজার প্রহরীরা ধরেছে। প্রত্যেককে চারশ করে চাবুক কশেছে। উটের পিঠে উল্টো করে বসিয়ে সমস্ত মহল্লায় ঘুরেয়েছে। ফাঁসি দিয়েছে!"

কথাটা শুনে আবুল রেগে বলল, "পাজি বুড়ী! তোমার কথাইতো প্রমাণ করে দিচ্ছে যে আমি কোন ভুল করছি না। ঐ তিনজনকে শাস্তি দিতে আমিই-তো প্রহরীদের পাঠিয়ে ছিলাম।

আহমদকেও পাঠিয়ে ছিলাম। তুমি আর মুখ নেড়ে বল না যে আমি স্বপ্ন দেখেছি। বলনা যে আমার মাথায় ভূত চেপেছে! তুমি এক্ষুণি আমার সামনে সাষ্টাঙ্গে পড়ে আমার কাছে পড়ে ক্ষমা চাও।"

আবুলের মা বুঝল যে ছেলে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। সে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কেঁদে কেঁদে বলল, "আল্লাহ, কৃপাকরে তোর পাগলামী সারালে সারাবেন। দোহাই তোর! তুই আর নিজেকে 'খলিফা খলিফা' বলে চিৎকার করিস না। আশপাশের লোক শুনতে পেয়ে রাজার কানে তুলে দিলে রাজা তোকে ফাঁসি দেবে।" লাঠি হাতে তুলে নিয়ে তার মাকে বলল, "আমাকে আবুল বলে আর ডেকো না। আমিই বাদশাহ হারুণ-অল-রশীদ!

ছেলে আবুলকে মা শান্ত স্বরে বলল, "বাবা, তোর মাথা এতটা গোলমাল হয়ে গেল কেন বাবা! নিজেকে যে তুই খলিফা বলছিস, এ যে তোর পাপ বাবা! কৃতজ্ঞতা বলে একটা জিনিস আছে তো। সবে কালকে খলিফা স্বয়ং আমাকে এক হাজার দীনার দিয়ে আরও পাঠাব বলে খবর পাঠিয়েছেন।"

আবুলের মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল, মার এই কথা শুনে তা একেবারে লোপ

পেল। আবুল নিজেইতো তার মার নামে এক হাজার দীনার পাঠিয়ে ছিল।

আবুল হোসেন মার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, "একথা বলে তুমি কি বলতে চাও যে ঐ হাজার দীনার আমি তোমাকে পাঠাইনি? যে লোকটা দীনার তোমার হাতে দিয়ে গেল সে কি আমারই নির্দেশে দিয়ে যায় নি? এত করার পরেও তুমি আমাকে এখনও আবুল হোসেন বলে ডাকছ?" বলতে বলতে সে তার মার গায়ে লাঠি চালাল।

এই ভাবে মার পড়াতে আবুলের মা আর সহ্য করতে না পেরে আর্তনাদ করতে লাগল। তার আর্তনাদ শুনে
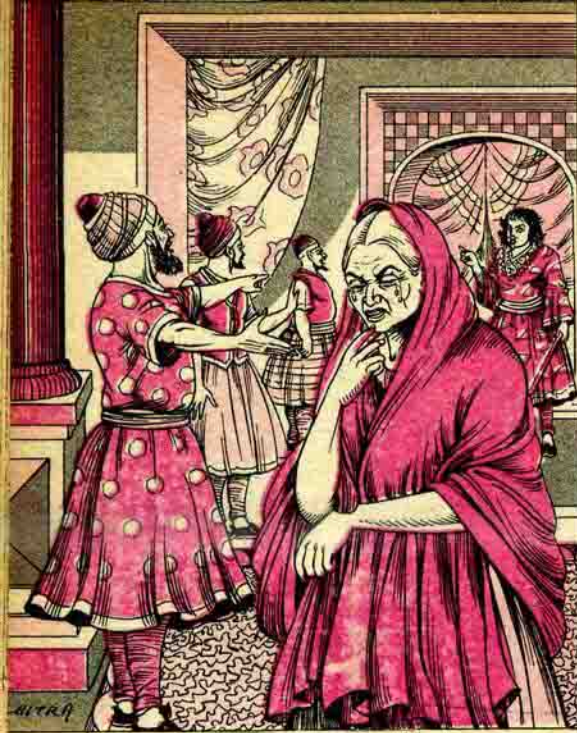
আশে পাশের লোক ছুটে এসে আবুলের লাঠির আঘাত থেকে তার মাকে বাঁচাল। তার হাত থেকে লাঠি টান মেরে কেড়ে নিল। তারপর তার হাত পা বেঁধে তাকে বলল, "আরে আবুল! তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? নিজের মার গায়ে তুই লাঠি তুলছিস? কোরানে যা পড়েছিস তা কি সব ভুলে গেছিস?"

আবুল হোসেন চিৎকার করে বলল, "আবুল হোসেন আবার কে? তোমরা কি আমাকেই ঐ নামে ডাকছ?"

প্রতিবেশীরা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে বলল, "তুমি কি আবুল হোসেন নও? কি তোমার জন্মদায়িনী মা নয়?"

"ওরে গাধার দল! তোমরা ভাগ এখান থেকে! মনে রেখ আমি তোমাদের বাদশাহ! আমি হলাম খলিফা হারুণ-অল-রশীদ!" আবুল হোসেন চিৎকার করে বলল।

আবুল হোসেনের বদ্ধ পাগল হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবেশীদের আর কোন সন্দেহ রইল না। এহেন পাগল ছাড়া রাখা অনুচিত ভেবে ওরা আবুলের হাত পা বেঁধে পাগলা গারদের লোককে খবর দিল। এক ঘন্টার ভিতর পাগলা গারদের কর্মকর্তা দুজন সেপাই নিয়ে হাজির হল। ঐ সেপাইদের হাতে হাত-কড়া ও শেকল ছিল।

ওদের দেখেই আবুল হোসেন দাঁত মুখ খিচিয়ে উঠল। পর মূহূর্তেই ওরা আবুল হোসেনের পিঠে কয়েক ঘা চাবুক মারল। বার বার আবুল নিজেকে হারুণ-অল-রশীদ বলে ঘোষণা করছিল। কিন্তু করলে কি হবে যারা চাবুক মারার তারা সমানে চাবুক মেরে চলল। আবুলের কথা কেউ কানে তুলল না। সোজা নিয়ে গেল পাগলা গারদে। গারদে নিয়ে গিয়ে প্রথমেই পঞ্চাশ বার চাবুক কশল।

টানা দশ দিন চাবুক খেয়ে আবুল হোসেন যেন ক্রমশ ভুল বকা থামাল। তার ভাবনায় পরিবর্তন লক্ষ্যিত হল।

এর মাঝে আবুল ভাবতে লাগল ; আমার অবস্থাতো ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে ! আমাকে যে লোক পাগল ভাবছে তারজন্য তো আমিই দায়ী। আমি রাজপ্রাসাদে ছিলাম বলে আমি হয়ত স্বপ্ন দেখে ছিলাম। কিন্তু দেখেতো একবারও মনে হয়নি যে সেটা স্বপ্ন। আমি পাগল হয়ে গেলাম, আর পারছি না ! আমি আর পারছি না। আল্লাহ না জানি কত বিচিত্র কাণ্ড করছেন !

আবুল হোসেন এইসব সাত পাঁচ ভাবছে এমন সময় তার মা তাকে দেখতে পাগলা গারদে এল। ছেলেকে দেখে মার বুক যেন খান্ খান্ হয়ে গেল। সে কান্না চেপে বলল, "বাবা আবুল, কেমন আছ ?"

"মা আল্লা তোমাকে ভাল রাখুক।" আবুল শান্ত স্বরে বলল।

বুড়ী খুশী হয়ে বলল, "বাবা, আল্লার দয়ায় তোর মতি গতি ফিরেছে।"

"মা আমি তোমার কাছে আর আল্লার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি বুঝতে পারছি না আমি কেন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। কোন শয়তান আমার ভিতর ঢুকে আমার মুখ দিয়ে হয়ত ঐ সব আবোল-তাবোল কথা বকিয়েছে। যাক যা হবার হয়েছে। এবার আমি ঠিক হয়ে গেছি।" আবুল হোসেন বলল।

"তোর কথা শুনে বাবা আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে কি বলব ! মনে হচ্ছে আমি যেন তাকে নতুন করে পেয়েছি।" আবুলের মা বলল।

আবুলের মার আবেদন শুনে পাগলা গারদের অধিকারী আবুলকে পরীক্ষা করে বুঝতে পারে যে তার পাগলামী সেরে গেছে। তখন কর্তৃপক্ষ তাকে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আবুল ক্লান্ত অবসন্ন দেহে টলতে টলতে মার সাথে বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফিরলেও অত বেশি চাবুক খাওয়ার ফলে সে আর কিছু করতে পারছিল না। বিছানায় শুয়ে থাকতে হল আবুল হোসেনকে। (চলবে)

উফ্

এক গ্রামে এক গরীব বিধবা ছিল। তার ছিল অজয় নামে সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে। সে সুন্দর হলেও কাজের ছিল না। কাজের নামে তার জ্বর আসত।

একদিন তার মা তাকে বলল, "বাবা, একটু উঠে দুটো কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আয়, দুমুঠো ভাত ফোটাব।"

"ফোটানোর কি দরকার মা, কাঁচা চাল খাওয়া যাবে না?" অজয় বলল। কারণ সে ছিল ভীষণ কুঁড়ের হদ্দ।

ছেলের মা ভাবল ছেলেকে দিয়ে কাঠ আনান যাবে না। তাই নিজেই কাঠ কুড়িয়ে আনতে গেল। ফেরার পথে একটা কুয়া পড়ে। কুয়ার কাছে কাঠের বোঝা রাখতে রাখতে ক্লান্তিতে বলল, "উফ্!" পরক্ষণেই কুয়ার ভেতর থেকে এক রাক্ষস বেরিয়ে এসে বুড়িকে জিজ্ঞেস করল, "বুড়ি মা, আমাকে আমার নাম ধরে ডাকলেন কেন?"

বিধবা বুড়ি ঐ রাক্ষসকে দেখে ঘাবড়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে বলল, "না, বাবা, আমি তোমাকে ডাকেনি।"

"ডাকেননি মানে 'উফ্' নামে আর কেউ এখানে আছে নাকি? একমাত্র আমারই নাম উফ্।" রাক্ষস বলল।

"আমি একথা জানতাম না বাবা। কেন বলছি তাও শোন। আমার এক জোয়ান সুন্দর ছেলে আছে। কিন্তু ও কোন কাজ করতে চায় না। তাই সব কাজ আমাকে করতে হয়। এই কাঠের বোঝা রেখে তাই উফ বলে ছিলাম।" এইভাবে শুরু করে বিধবা ছেলের কথা রাক্ষসটাকে জানাল।

সমস্ত কাহিনী শুনে রাক্ষস বলল, "তুমি তোমার ছেলেটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। পরিবর্তে তোমাকে এক

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

আঁজলা সোনা দিয়ে দেব।"

"তাতো দেবে কিন্তু বাবা তুমি ওকে খাবে না তো? তোমাকে দেখে কিন্তু ভীষণ ভয় করছে।" বিধবা বলল।

"আমি মানুষের মাংস খাই না।" একথা বলে রাক্ষসটা সোজা কুয়ার ভেতর চলে গেল। পরক্ষণেই এক আঁজলা ভর্তি সোনা এনে বিধবাকে দিল, দিয়ে বলল, "মনে রেখ। তুমি তোমার ছেলেকে না দিয়ে গেলে আমি তোমাকে আর তোমার ছেলেকে মেরে ফেলব।"

বিধবা বাড়ি ফিরে রান্না করতে করতে কাঁদতে লাগল। অজয় জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে মা? তুমি কাঁদছ কেন?" বিধবা তখন ছেলেকে সমস্ত ঘটনা জানাল। অজয় বলল, মা "তুমি কোন চিন্তা করনা। আমি ঐ রাক্ষসের কাছে গিয়ে অনেক কিছু শিখে আসব।"

তারপর মা-ছেলে দুজনে কুয়ার কাছে গিয়ে ডাকল, "উফ্। উফ্।"

তৎক্ষণাৎ সে কুয়া থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "বুড়ি মা, তোমার ছেলে?"

তারপর, বুড়িকে আরও এক আঁজলা ভর্তি সোনা দিয়ে অজয়কে বলল, "ভাই, তুমি আমার সাথে আমাদের বাড়িতে এস। তোমাকে ঘর দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব নিতে হবে। আমি সারাদিন ঘরে থাকি না। তুমি যত ইচ্ছা বিশ্রাম করতে পারবে।"

"ব্যস তাহলেই খুশী।" অজয় বলল।

তারপর রাক্ষস ও অজয় কুয়াতে ঝাঁপ দিল। কুয়ার তলায় এক রাজ-প্রাসাদ এবং উদ্যান ছিল।

সেখানে পৌঁছানোর পর রাক্ষস অজয়কে বলগ, "আমি বাইরে যাচ্ছি। তুমি ঘরদোর দেখাশোনা কর। খাওদাও পিছনের দিকে ঘোরাঘুরি কর। কিন্তু উদ্যানে যেয়ো না। তুমি উদ্যানে গেলে আমি তোমাকে মারব।"

একটা ঘরে খাবার পরিবেশন করা ছিল। অজয় পেট ভরে খেয়ে মনে মনে

ভাবল, এই চাকরিটাতো মন্দ নয়। প্রাসাদের পিছনে কিছুক্ষণ পায়চারি করে শেষে উদ্যানের দরজা খুলে পা রাখল।

উদ্যানে সব রকমের ফুলের গাছ ও নানান ধরণের পাখি ছিল। পাখিরা গান গাইছিল আর ফুলের সুগন্ধে ভরা ছিল সেই উদ্যান। অজয় মনে মনে ঠিক করল প্রত্যেক দিন সে উদ্যানে আসবে।

অজয় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। একদিকে নজর পড়ল এক কুটির। সেই কুটিরের দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল এক পরমা সুন্দরী। অজয়কে ইশারায় সে কাছে ডাকল।

"সাবধান! ফুল ছুঁয়েছ কি উফ্ জেনে যাবে। উফ্ যেদিন খেতে পায় না সেদিন সে মানুষের মাংস খায় না বটে কিন্তু অন্য যে কোন মাংসতো খায়। কোথাও খেতে না পেলে বাড়ি ফিরে তোমাকে এক ধরণের জল খাওয়াবে। তারপর তোমার আড় ভাঙ্গালেই একেবারে জানোয়ার হয়ে যাবে। উফ্ তোমাকে যে জানোয়ার হতে বলবে তুমি সেই জানোয়ার হয়ে যাবে। অতএব এরকম অবস্থায় তুমি জল খেতে পার, হাত পা নাড়তে পার, কিন্তু আড় ভেঙ্গেছ কি মরেছ। শেষ পর্যন্ত আমাকে দিয়ে লাল জল আনাবে। আমার আনা লাল জল তোমাকে পান করতে বলবে। তুমি পান করার পর তোমাকে কোন এক জানোয়ার হতে বলবে। তবে জান, ঐ জল পান করার পর তুমি হবে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। তখন তুমিও তোমার ইচ্ছেমত যে কোন পশু হতে পারবে। যাও, আর নয়। এখন গিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করার কাজে লেগে যাও।" কন্যা অজয়কে বলল।

অজয় প্রাসাদে ফিরে এল। পরিষ্কার করার কাজ শেষ করে প্রাসাদের পিছনে গিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

অনেক দেরি করে উফ প্রাসাদে ফিরল। ভীষণ খিদে পেয়ে ছিল তার।

সেদিন কয়েকটি ফলমূল ছাড়া আর কিছু মনের মত জিনিস সে খেতে পেল না। প্রাসাদে ফিরেই উফ্ অজয়কে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি করছিলে ?"

"ঘরদোর পরিষ্কার করছিলাম।"

"ঠিক আছে, তোমাকে কিছুক্ষণ পড়াতে চাই। এক নতুন ধরণের বিদ্যা। নাও এই জল পান করে আড় ভেঙ্গে খরগোশ হয়ে যাও।" উফ্ বলল।

অজয় জল খেয়ে হাত পা নেড়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"আরে ধ্যাৎ! কি করছ? আড় ভাঙ্গো না!" বলল উফ্।

"আমি কি আড় ভাঙ্গছিনা ?" অজয় বিবিকার ভাবে প্রশ্ন করল।

"আরে তুমি তো ভীষণ বোকা দেখছি!" একথা বলে উফ্ অন্য পাত্রের জল অজয়কে পান করতে দিয়ে বলল, "নাও এই জল পান করে ছাগল হও।"

কিন্তু অজয় ঐ জল পান করে এমন সব অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল যেন সে আর ভাঙ্গতে পারে না। উফ্ এর খিদে আরও বেড়ে যেতে লাগল।

তারপর উফ্ উদ্যানে গিয়ে কন্যাকে বলল, "দেখতো কি অবস্থা! আজ আমি একদম মাংস খেতে পাইনি। এ বোকা ছেলেটাকে আড় ভাঙ্গতে বলছি সে
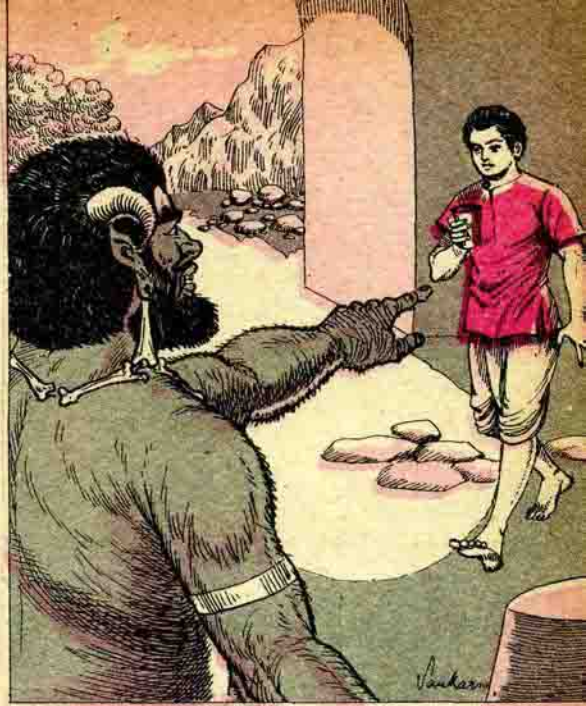
কিছুতেই তা পারছে না।"

"মনে হয় খুব বোকা। জ্ঞান বুদ্ধি একেবারে নেই। ওকে লাল জল না খাওয়ালে একেবারেই বুদ্ধি খুলবে না।" কন্যা বলল।

"লাল জল খেয়ে তো সে আমার সমতুল্য জ্ঞানী হয়ে যাবে! সেটাতো আরও খারাপ হবে!" উফ্ বলল।

"জ্ঞানী হয়েও আর কি করতে পারবে ? আড় ভাঙ্গালেই তুমি তাকে জানোয়ার হতে বলবে। ও তৎক্ষণাৎ জানোয়ার হয়ে যাবে। তুমি তাকে খেয়ে ফেলবে।" কন্যা বলল।

"ভাল পরামর্শ দিয়েছ। যাও, লাল

জল নিয়ে এস।" উফ্ বলল।

ঐ কন্যা কুটির থেকে লাল জল এনে দিল উফ্‌কে। উফ্ একটা পাত্রে সেই জল নিয়ে অজয়কে খেতে দিয়ে বলল, "তুমি এই পাত্রের জল খেয়ে হরিণ হও।"

অজয় সেই লাল জল পান করে মনে মনে পায়রা হতে চাইল। মুহূর্তে পায়রা হয়ে কুয়া থেকে বেরিয়ে গেল উফ্। তৎক্ষণাৎ বাজ পাখি হয়ে পায়রাকে ধাওয়া করল। তখন অজয় তাড়াতাড়ি মাছি হয়ে এক স্নানাগারের দরজার তালার ভিতর ঢুকে গেল।

তারপর উফ এক ধনী লোকের রূপ ধারণ করে। স্নানাগারের মালিকের কাছে জিজ্ঞেস করল, "এই স্নানাগার বিক্রী করবে?"

"নায্য দাম পেলে কেন বেচব না?" স্নানাগারের মালিক বলল।

ধনী লোকটি স্নানাগারের মালিক যত চাইল তত দিয়ে তার কাছ থেকে স্নানাগার কিনে নিল। তালার চাবিও নিয়ে নিল। তখন ঐ মাছি বাইরে উড়তে লাগল। তখন উফ্ চামচিকে হয়ে মাছিকে ধাওয়া করল। উফের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য অজয়-মাছি চাঁপা ফুল হয়ে এক রাজার প্রাসাদের অন্তঃপুরে ঢুকে এক রাজকন্যার কোলে পড়ে। রাজকুমারী ঐ চাঁপা ফুলটি নিজের বেণীতে গুঁজে নিল।

পরক্ষণেই উফ্ রূপ বদল করে নিল। সে এবার হল তুর্কীর রাজদূত। সে রাজার সাথে দেখা করে বলল, "মহারাজ, আমি দেশ থেকে বেরুনোর মুহূর্তে আমার মা আমাকে আশীর্বাদ করে এক চাঁপা ফুল দিয়ে ছিলেন। সেই ফুল আমার কাছে এক অমূল্য জিনিস। এক ময়না আমার পকেট থেকে ঐ ফুল তুলে নিয়ে সোজা আপনার অন্তঃপুরে ঢুকে গেছে। আপনি দয়া করে আমার ফুল অন্দর মহল থেকে আনিয়ে দিন।"

ততক্ষণে অজয় এক সুন্দর যুবকের

রূপ ধারণ করে সেই রাজকন্যাকে বলল, "রাজকুমারী, আমি একটি দেশের রাজকুমার। আমার এক শত্রু এসে আমাকে চাইবে। আমরা দুজনে তন্ত্রমন্ত্র বিদ্যায় সমান দক্ষ। দোহাই আপনার, আপনি আমাকে ওর হাতে তুলে দিবেন না। ও আমাকে বাগে পেলেই শেষ করে ফেলবে। আপনি দয়া করে আমাকে ওর হাতে তুলে দেবেন না।" এই কথা বলে অজয় আবার চাঁপা ফুলে পরিবর্তিত হল। পরক্ষণেই এক সখী রাজকুমারীর কাছে এসে বলল, "রাজকুমারী আপনার কোলে যে চাঁপা ফুল পড়েছিল মহারাজ সেই ফুল চেয়েছেন।"

রাজকুমারী বিরক্ত হয়ে বলল, "আমাদের উদ্যানে হাজারটা চাঁপা ফুল আছে। তুলে মহারাজকে দিয়ে দাও।"

সখী উদ্যানে গিয়ে পাঁচ-দশটা চাঁপা ফুল নিয়ে রাজদূতের হাতে দিল। রাজ-দূতরূপী উফ্ ফুলগুলো শুঁকে রাজাকে বলল, "মহারাজ, আমার সেই পবিত্র ফুলতো এর মধ্যে নেই।"

রাজা ভীষণ চটে গিয়ে সখীকে বললেন, "তুমি এক্ষুনি রাজকুমারীর কাছ থেকে তাড়তাড়ি ঐ ফুলটা নিয়ে এস। না দিলে যাব ফুলটা আনতে।"

সখী রাজকুমারীর কাছে গিয়ে তাই বলল। রাজকুমারী বাধ্য হয়ে ঐ ফুল সখীর হাতে দিল। রাজা ঐ ফুল তুর্কীর রাজদূতের হাতে দিতে যাবেন এমন সময় ঐ ফুল একটি গমের দানা হয়ে নীচে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ রাজদূত মুরগী হয়ে ঐ দানা মুখে তুলতে যাবে এমন সময় ঐ দানা শেয়াল হয়ে মুরগীকে খেয়ে ফেলল।

এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে রাজার তো একেবারে মাথা ঘুরতে লাগল। চিৎকার করে উঠলেন। সেই মুহূর্তে শেয়াল এক যুবকের রূপ ধারণ করে বলল, "মহা-রাজের জয় হোক! আমি এক রাজ-কুমার! আমার মা এক গন্ধর্ব নারী। উনিই আমাকে সমস্ত মন্ত্র শিখিয়েছেন।

আপনার সামনে এতক্ষণ যে লোকটা ছিল সে আমার চাকর। সে আমার সমস্ত বিদ্যা শিখে আমাকেই শেষ করতে যাচ্ছিল। মহারাজ, আপনি বলুন, যারা অন্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত ?"

"ও! এই ব্যাপার! ভালই হয়েছে, তোমার শত্রু মারা গেছে। একটা কথা। তোমার কোন আপত্তি না থাকলে তুমি আমার একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে আমার এখানেই থাক।" রাজা বললেন।

"আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তবে আমাকে এক সপ্তাহের অনুমতি দিলে আমি আমার বকেয়া কাজ সেরে আসতে পারি।" অজয় বলল।

রাজার স্বীকৃতি দানের পর সে পায়রার রূপ ধারণ করে কুয়ার কাছে গেল। সেখানে দেখত পেল তার মা অপেক্ষা করছে। অজয় নিজের আসল রূপধারণ করে মাকে জিজ্ঞেস করল, "মা তুমি এখানে কি করছ ?"

"বাবা! আমি তোমাকেই খুঁজছি বাবা! উফ্ যে সোনা দিয়ে ছিল আমি তাকে সেই সোনা ফেরৎ দিতে এসেছি। তোমাকে নিয়ে যাব বাবা!"

"মা, উফ তো আর নেই। সে মারা গেছে। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। আমি তাড়তাড়ি ফিরব।" অজয়ের মা বাড়ি ফিরে গেল। তারপর সে বাজপাখির রূপ ধারণ করে কুয়াতে নাবল। উদ্যা-নের কন্যাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি নিজের মা-বাবার কাছে ফিরে যাবে না আমার কাছে থাকবে ?"

সেই কন্যা নিজের মা-বাবার কাছে ফিরে যেতে চাইল। সেও লাল জল পান করে পাখি হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

বাজপাখির রূপ ধরেই অজয় ঐ রাজার কাছে গেল। সেখানে নিজের আসল রূপ ধারণ করে রাজকুমারীকে বিয়ে করল। তারপর নিজের মাকে রাজমহলে আনিয়ে সবাই মিলে সুখে জীবনযাপন করতে লাগল।

অনেক দিন আগের কথা। মাহোবা নামক গ্রামে বহু ধনবান ছিল। সেই গ্রামে রাম সাহা নামে এক বণিক ছিল। তার ছিল দুই ছেলে। বাপ ছেলেতে মিলে একটা সাধারণ ব্যবসা করত।

রাম সাহা এক সময়ে খুব ধনী ছিল। কিন্তু ব্যবসা করতে গিয়ে নিজের সর্বস্ব খোয়াল। শুধু এক বিরাট বাড়ি ছাড়া সম্পত্তি বলতে আর কিছুই রইল না। তবু লোকটা হতাশ হল না। সে আবার ব্যবসা শুরু করল একটি আশায়: ভবিষ্যতে এক দিন না একদিন তার ভাগ্য প্রসন্ন হবেই।

সে বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার প্রবল আশা তার মনে দাঁনা বেঁধে ছিল।

মাহোবা ধনীদের গ্রাম ছিল। তাই যখন তখন সেই গ্রামে লুণ্ঠনকারীরা হামলা করত। লুণ্ঠনকারীদের আগমনের খবর পেয়েই গ্রামের ধনীরা নিজেদের ধন-সম্পত্তি মাটিতে পুঁতে দিত। অথবা ধনদৌলত নিয়ে অন্য গ্রামে পালিয়ে যেত।

একবার লুণ্ঠনকারীরা গ্রামে এল। ওদের আসার সাথে সাথে গোটা গ্রামের ধনীরা পালাল। কিন্তু রাম সাহা ছেলেদের বলল, "বাপধনেরা, আমি তোমাদের সাথে যেতে পারি না। দুদিন এখানেই কোথাও মাথা গুঁজে থাকব। বাড়ির পেছনের খড়ের গাদার কোণে তোমরা আমার জন্য খাবার-দাবার কিছু রেখে চলে যাও।

ছেলেরা বাবার কথা মত কিছু ভাল খাবার রেখে চলে গেল।

লুণ্ঠনকারীরা গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাড়ি বাড়ি ঢুকে কোথায় সোনাদানা আছে খোঁজ করতে লাগল। ওদের নেতা

এ. দাস

ঘোড়া থেকে নেমে দুটো থলেতে যে সোনা পেল তা পুরে নিল। ফিরে যেতে যাবে এমন সময় সেই নেতার নজর পড়ল রাম সাহার বিরাট বাড়িটার উপর।

লুণ্ঠনকারীদের নেতা ঐ থলে দুটো ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে তাকে সযত্নে ঐ গাদার কাছে এক বড় পাথরে বেঁধে খুব সাবধানে এক পা এক পা করে ঐ বিরাট বাড়ির একটি ঘরে ঢুকল।

ঐ নেতার কাজকর্ম রাম সাহা খুব সাবধানে লক্ষ্য করছিল। তার মন ছট-ফট করতে লাগল। ঘোড়ার খিদে পেয়ে ছিল তাই সে চরতে লাগল।

সুযোগ বুঝে রাম সাহা খড়ের গাদার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। ঘোড়ার পিঠ থেকে থলে দুটো নাবিয়ে ঘোড়ার দড়ি ছিঁড়ে দিল। তারপর সেই থলে দুটো নিয়ে ঐ খড়ের গাদার ভেতর ঢুকে ঘাপটি মেরে বসে রইল। দড়ি ছিঁড়ে যাওয়াতে ঘোড়া চরতে চরতে অনেক দূর চলে গেল।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও অত বড় বাড়িতে লুণ্ঠন নেতা কিছুই পেলনা। বাইরে এসে দেখে তার ঘোড়া অনেক দূরে চরছে। তার চেয়ে অবাক কাণ্ড ঘোড়ার পিঠে কোন থলি নেই!

লুণ্ঠন-নেতা ঐ থলে দুটো খোঁজাখুঁজি করতে লাগল আশপাশের জায়গায়। তখন ঐ নেতার কয়েকজন অনুচর তার কাছে এল। তাদের দেখে নেতা ব্যস্ত

হয়ে প্রশ্ন করল, "তোমরা কেউ কি ধন সম্পদে ভরা থলিগুলো দেখেছ?"

চোরগুলো একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তাদের মনে নেতার উপর সন্দেহ জাগল। তাদের মনে হল তাদের চোখে ধূলো দিতে ঐ নেতা অভিনয় করছে। আসলে নেতাই চুরি করে মাল সরিয়ে ফেলেছে, তাদের ঠকানোর তাল করছে। তারপর লুণ্ঠন-কারীরা সবাই জড় হয়ে নেতাকে প্রশ্ন করল, "এখানে তো আমরা ছাড়া আর কোন জনপ্রাণী নেই। অত সোনা ভরা ভারি ভারি থলি যাবে কোথায়?"

তারপর সকলে মিলে ঐ থলিগুলো খুঁজল কিন্তু কোন লাভ হল না। তখন লুণ্ঠন-নেতা ঐ থলি দুটো খোঁজার দায়িত্ব নিজেই নিল।

পরের দিন লুণ্ঠনকারীরা মাহোবা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল।

তাদের চলে যাবার পর ঐ গ্রামের মানুষ গ্রামে ফিরে এল। রাম সাহা অত্যন্ত সাবধানে ঐ থলি দুটো লুকিয়ে রাখল ঘরে। নিজের ছেলেদেরও ঐ থলিগুলোর কথা জানাল না। রাম সাহা জেনে ছিল যে লুণ্ঠন-নেতা নিজে দায়িত্ব নিয়েছে ঐ থলি দুটো খোঁজার।

রাম সাহা যা ভেবেছিল তাই হল। ঐ লুণ্ঠন-নেতা ঘোড়ার ব্যবসায়ী হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে ঐ গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার উদ্দেশ্য ছিল

রাতারাতি কেউ বড়লোক হয়েছে কিনা জানা। গোপনে খোঁজ করা। রাম সাহা ঐ লোকটাকে দেখেই চিনতে পারল। তার মনে হল লুণ্ঠনকারীরা রাত্রে হঠাৎ তার বাড়িতে হানা দিতে পারে। তাই সে ঐ খড়ের গাদার উপর সারারাত নজর রেখেছিল। যা আশঙ্কা করেছিল তাই। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে লুণ্ঠন-নেতা বাড়ির পিছন দিক দিয়ে গিয়ে দরজার কাছে ঘাপটি মেরে বসেছিল রাম সাহার বাড়ির লোকের কথা শুনতে।

রাম সাহা আড়ালে থেকে এ সব লক্ষ্য করছিল। সে নিজের ছেলেদের জোর গলায় ডেকে বলল, "ওরে তোরা শোন, পরশু খড়ের গাদা থেকে খড় পাড়তে গিয়ে দেখি সেখানে দুটো সোনার গহনা-ভরা থলে রয়েছে।"

রাম সাহার ছেলেরা বলল, "তাই না কি? কোই সে কথা তুমি তো আমাদের বল নি।"

"বাবারে ঐ দু থলে ভর্তি সোনার গহনা কার-না-কার না জেনে আমি তোদের কি আর বলব বল? তাই অনেক ভেবে চিন্তে লুকিয়ে রেখেছি।"

"কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?" ছেলেরা প্রশ্ন করল।

"আমাদের কুয়াতে লুকিয়ে রেখেছি।" রাম সাহা জবাবে বলল।

লুণ্ঠন-নেতা রাম সাহার কথা আড়ি পেতে শুনে ভীষণ খুশী হল। সবার ঘুমানোর পর একটা দড়ি দিয়ে কুয়ার ভেতরে নাবল।

তৎক্ষণাৎ রাম সাহা তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে দুই ছেলেকে ঘটনাটা জানিয়ে দিল। তিন জনে মিলে কুয়ার কাছে গিয়ে দড়ি কেটে দিল। তারপর বড় বড় পাথর কুয়াতে ছুঁড়ে লুণ্ঠন-নেতাকে মেরে ফেলল। লাশ বাড়ির পিছনে ভোর হওয়ার আগেই পুঁতে দিল।

তারপর রাম সাহা সারাজীবন ধনী লোকের মত জীপনযাপন করতে লাগল।

সিংহের মত বলিষ্ঠ সেই যুবা কৌরব-গণকে উপহাস করে তাঁদের বসন হরণ করেছেন। বিরাট বললেন, "সেই মহা-বাহু দেবপুত্র কোথায় ?"

উত্তর বললেন, "পিতা, তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন, বোধ হয় কাল বা পরশু দেখা দেবেন।"

বৃহন্নলাবেশী অর্জুন বিরাটের অনুমতি নিয়ে তাঁর কন্যা উত্তরাকে কৌরবগণের মহামূল্য বিচিত্র সূক্ষ্ম বস্ত্রগুলি দিলেন। তারপর তিনি উত্তরের সাথে নির্জনে পরামর্শ করে যুথিষ্ঠিরাদির আত্ম-প্রকাশের উদ্যোগ করলেন।

তিন দিন পরে পঞ্চপাণ্ডব স্নান করে শুভ্র বসন পরে রাজযোগ্য আভরণে সজ্জিত হলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে অগ্র-ভাগে রেখে বিরাট রাজার সভায় গিয়ে রাজাসনে উপবেশন করলেন।

একথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে রাজা বিরাট রাজকার্য করবার জন্য সভায় এলেন এবং তাঁদের দেখে রেগে উঠে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "কঙ্ক, তোমাকে আমি সভাসদ্ করেছি। তুমি রাজাসনে বসেছ কেন ?"

অর্জুন সহাস্যে বললেন, "মহারাজ ইনি ইন্দ্রের আসনেও বসবার যোগ্য। ইনি মূর্তিমান ধর্ম, ত্রিলোক বিখ্যাত রাজর্ষি, ধৈর্যশীল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়। ইনি যখন কুরুদেশে ছিলেন তখন দশ হাজার হাতী এবং কাঞ্চনমালা ভূষিত অশ্বযুক্ত ত্রিশ

হাজার রথ এঁর পেছনে যেত। এঁর ঐশ্বর্য ও প্রতাপ দেখে দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি প্রভৃতি ব্যথিত হতেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সামান্য এই রাজাসনে বসবেন না কেন?"

বিরাট বললেন, "ইনি যদি কুন্তী পুত্র যুধিষ্ঠির হন তবে এঁর ভ্রাতা ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব কারা? যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কে?"

এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা বিরাটকে অর্জুন বললেন, "মহারাজ, বল্লভ নামে আপনার রন্ধন শালায় যে পাচকের কাজ করে সেই ভীম। গন্ধর্বরা তারই হাতে পরাজিত। কীচক বধ এই ভীমের কাজ। কীচক বধ এই ভীম ছাড়া আর কেউ করতে পারত? আর আপনার অশ্বশালা দেখার কাজ যাকে দিয়েছেন তিনি নকুল।" গরুদের রক্ষণাবেক্ষণ করার ভার যার উপরে দিয়েছেন তিনি সহদেব। আপনার অন্তঃপুরে যাকে রেখেছেন সেই সৈরিন্ধ্রীই দ্রোপদী। আর আমি অর্জুন। সন্তান যেমন মাতৃগর্ভে বাস করে আমরা তেমনই আপনার রাজপ্রাসাদে সুখে অজ্ঞাতবাস করেছি।" এই বলে তিনি পরিচয় দিলেন।

উত্তর পাণ্ডবগণকে একে একে দেখিয়ে বললেন, "এই যে খাঁটি স্বর্ণের মত গৌর-বর্ণ বিশালকায় পুরুষ দেখছেন, যাঁর দীর্ঘ নাক, চক্ষু তাম্রবর্ণ ইনিই কুরুরাজ যুধিষ্ঠির। মত্ত হাতীর মত যাঁর গতি, যিনি অগ্নিশোধিত স্বর্ণের মত বর্ণ স্থূল-স্কন্ধ মহাবাহু ইনিই ভীম, এঁকে দেখুন। এঁর পাশে যে শ্যামবর্ণ সিংহস্কন্ধ গজেন্দ্র-গামী আয়তচক্ষু যুবা রয়েছেন, ইনিই মহাধনুর্ধর অর্জুন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের মত যে দুজনকে দেখছেন, রূপে বলে ও চরিত্রে যাঁরা অতুলনীয়, এঁরাই নকুল-সহদেব। আর যাঁর সৌন্দর্য নীল পদ্মের মত, মাথায় সোনার আভরণ, যিনি মূর্তিমতী লক্ষ্মীর মতই পাণ্ডবগণের পাশে রয়েছেন ইনিই

দ্রৌপদী।"

পাণ্ডবদের পরিচয় পাবার পর অর্জুন কীভাবে কতখানি পরাক্রমের সাথে যুদ্ধ করেছেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে উত্তর বললেন : "মহারাজ, সিংহ যেমন হরিণের পিছু ধাওয়া করে তাকে মেরে ফেলে তেমনি অর্জুন কৌরব-যোদ্ধাদের শিকার করেছেন। মাত্র একটি তীর দিয়ে ইনি হাতীকে মেরে ফেলেছেন। এঁর শঙ্খধনিতে আমার কানের পর্দা যেন ফেটে গেছে।

বিরাট তাঁর পুত্রকে বললেন, "আমি সম্পর্ক রক্ষা করতে চাই, যদি তোমার মত হয় তবে অর্জুনকে আমার কন্যা দান করব।

"মহারাজ প্রথমে আমাদের কর্তব্য হবে পাণ্ডবদের অভিনন্দন জানানো।" উত্তর বললেন।

একথা শুনে রাজা বিরাট বললেন, "তোমার কথাই ঠিক। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমি যখন সুশর্মার হাতে বন্দী ছিলাম তখন এই ভীমই আমাকে মুক্ত করলেন। আমাকে বিজয়ী করেছেন। পাণ্ডবরা সাহায্য না করলে আমি এ যাত্রা কোন ক্রমেই বিজয়ী হতে পারতাম না। তাই আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হবে পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে স্বাগত জানানো। অজান্তে যা করেছি তার জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

"ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির, আমরা না জেনে

যে অপরাধ করেছি তা ক্ষমা করুন। আমার এ রাজ্যে যা কিছু আছে সমস্তই আপনাদের। সব্যসাচী ধনঞ্জয় উত্তরাকে গ্রহণ করুন, তিনিই তার যোগ্য পাত্র।"

যুধিষ্ঠির অর্জুনের দিকে চাইলেন। অর্জুন বললেন, "মহারাজ, আপনার দুহিতাকে আমি পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করব, এই সম্বন্ধ আমাদের উভয় বংশেরই যোগ্য হবে।"

বিরাট বললেন, "আপনাকে আমার কন্যা দিচ্ছি, আপনি তাকে পত্নী রূপে নেবেন না কেন?"

অর্জুন বললেন, "অন্তঃপুরে আমি সব সময় আপনার কন্যাকে দেখেছি, সে নির্জনে ও প্রকাশ্যে আমাকে পিতার মত শ্রদ্ধা করেছে। নাচ গান শিখিয়ে আমি তার প্রীতি ও সম্মানের পাত্র হয়েছি। সে আমাকে আচার্যতুল্য মনে করে। আমি এক বৎসর আপনার বয়স্থা কন্যার সঙ্গে বাস করেছি। আমি তাকে বিবাহ করলে লোকে অন্যায় সন্দেহ করতে পারে। এই কারণে আপনার কন্যাকে আমি পুত্রবধূরূপে চাইছি, তাতে লোকে জানবে যে আমি শুদ্ধ স্বভাব জিতেন্দ্রিয়, আপনার কন্যারও অপবাদ হবে না। পুত্র বা ভ্রাতার সাথে বাস যেমন নির্দোষ, পুত্রবধূ ও দুহিতার সাথে বাসও সেইরূপ।

"আমার পুত্র মহাবাহু অভিমন্যু কৃষ্ণের ভাগিনেয়, দেববালকের মত রূপবান, অল্প বয়সেই অস্ত্র বিশারদ, সে আপনার উপযুক্ত জামাতা।"

অর্জুনের প্রস্তাবে বিরাট রাজী হলেন। যুধিষ্ঠিরও অনুমোদন করলেন। তার-পর সকলে বিরাট রাজ্যের নিকট উপপ্লব্য নগরে গেলেন এবং আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। দ্বারকা থেকে কৃষ্ণ বলরাম কৃতকর্মা ও সাত্যকি সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে নিয়ে এলেন।

ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যরাও পাণ্ডবদের

রথ নিয়ে এল। এক অক্ষৌহিনী সৈন্য সহ দ্রুপদ রাজা, দ্রৌপদী পঞ্চপুত্র, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্নও এলেন। মহা-সমারোহে বিবাহের উৎসব সম্পন্ন হল। শত শত মৃগ ও অন্যান্য পশুকে মারা হল। নানান ধরণের, বিভিন্ন রঙের মদ প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত আমন্ত্রিতরা পান করতে লাগল। সুন্দরী সুন্দরী নারীরাও যেন ঐ বিহাহোৎসবের অঙ্গ ছিল। তারা রকমারী পোষাক পরে রাণী সুদেষ্ণার সাথে বিবাহ সভায় এল। কিন্তু দ্রৌপদী ওদের সকলের চেয়ে রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের সামনে অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহ সম্পন্ন হল। বিরাট অভিমন্যুকে সাত হাজার দ্রুতগামী অশ্ব, দুশো ভাল ভাল হাতী এবং অঢেল ধন-সম্পত্তি যৌতুক দিলেন। কৃষ্ণ উপহার দিলেন প্রচুর ধনরত্ন, হাজার হাজার গরু, নানান ধরণের পোষাক এবং বিছানা, খাবার এবং পানীয়। যুধিষ্ঠির সেই উপহার ব্রহ্মারগণকে দান করলেন।

অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহের পর রাতে বিশ্রাম করে পাণ্ডবগণ প্রভাতকালে বিরাট রাজার সভায় এলেন। এই সভায় বিরাট দ্রুপদ বসুদেব বলরাম কৃষ্ণ সাত্যকি প্রদ্যুম্ন শাম্ব বিরাট—পুত্রগণ অভিমন্যু এবং দ্রৌপদী প্রমুখ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ নানা-প্রকার আলাপের পর সকলে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।
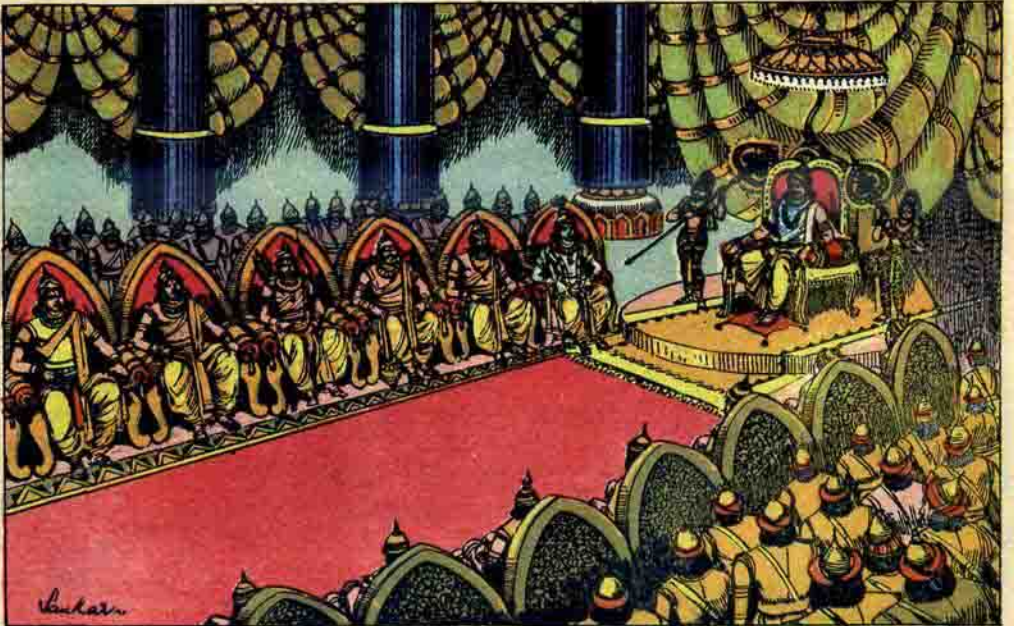
কৃষ্ণ বললেন, "আপনারা সকলে জানেন শকুনি পাশাখেলায় শঠতার দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে জয় করে রাজ্য হরণ করে-ছিলেন। পাণ্ডবগণ বহু কষ্ট ভোগ করে তাঁদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন। তাঁদের বার বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাত বাস শেষ হয়েছে। এখন যা যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন উভয়েরই মঙ্গল এবং কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষে ধর্ম সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও খ্যাতির তা আপ-নারা ভেবে দেখুন। যুধিষ্ঠির ধর্ম বিরুদ্ধ উপায়ে সুররাজ্যও চান না, বরং তিনি ধর্মসম্মত উপায়ে একটি মাত্র গ্রামের রাজত্বই উচিত মনে করেন। দুর্যোধনাদি প্রতারণা করে পাণ্ডবগণের পৈতৃক রাজ্য হরণ করেছেন, তথাপি যুধিষ্ঠির তাঁদের শুভ কামনা করেন। এঁরা সত্যপরায়ণ, নিজেদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন, এখন যদি অন্যায় ব্যব-হার পান তবে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে বধ করবেন। যদি আপনারা মনে করেন যে পাণ্ডবগণ সংখ্যায় অল্প সেজন্য জয়লাভে সফল হবেন না, তবে আপনারা মিলিত হয়ে এমন চেষ্টা করুন যাতে এঁদের শত্রুরা বিনষ্ট হয়। কিন্তু আমরা এখনও জানি না দুর্যোধনের ইচ্ছা কি, তা না জেনে আমরা কর্তব্য কোনক্রমেই স্থির করতে পারি না।

অতএব কোনও ধার্মিক সৎস্বভাব সদ্‌-বংশীয় সতর্ক দূতকে পাঠানো হোক, যাঁর কথায় দুর্যোধন শান্ত ভাবে যুধি-ষ্ঠিরকে অর্ধরাজ্য দিতে রাজী হবেন।"

বলরাম বললেন, "কৃষ্ণের বাক্য যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন উভয়ের জন্যই— মঙ্গল। শান্তির উদ্দেশ্যে কোনও লোককে দুর্যোধনের কাছে পাঠানোই ভাল। তিনি গিয়ে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ অশ্বত্থামা বিদূর কৃপ শকুনি কর্ণ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র-গণকে প্রণিপাত করে যুধিষ্ঠিরের সপক্ষে বলবেন। দুর্যোধনাদি যেন কোন মতেই ক্রুদ্ধ না হন, কারণ তারা বলবান,

yুধিষ্ঠিরের রাজ্য তাঁদের গ্রাসে রয়েছে। যুধিষ্ঠির দ্যূতপ্রিয় কিন্তু অজ্ঞ, সুহৃদ-গণের বারণ না শুনে দ্যূতনিপুণ শকুনিকে আহ্বান করেছিলেন। শকুনি নিজের শক্তিতেই এঁকে পরাস্ত করেছিলেন। তাতে তাঁর কোন অপরাধ হয়নি। যদি আপনারা শান্তি চান তবে মিষ্ট বাক্যে দুর্যোধনকে সন্তুষ্ট করুন।"

সাত্যকি বললেন, "তোমার যেমন স্বভাব তেমন কথা বলছ। আশ্চর্যের বিষয়, এই সভায় কেউ ধর্মরাজের কিছু-মাত্রও দোষের কথাও বলতে পারে। অক্ষনিপুণ কৌরবগণ অনভিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে ডেকে এনে পরাজিত করেছিল, এমন জয়কে কোন্ যুক্তিতে ধর্মসম্মত বলা যেতে পারে? যুধিষ্ঠির যদি নিজের ভবনে ভ্রাতাদের সাথে খেলতেন এবং দুর্যোধনাদি সেই খেলায় যোগ দিয়ে জয়লাভ করতেন তবেই তা ধর্মসম্মত হত। যুধিষ্ঠির কপট দ্যূতে পরাজিত হয়েছিলেন, তথাপি তিনি পণ রক্ষা করেছেন। এখন বনবাস থেকে ফিরে এসে ন্যায় অনুসারে পিতৃ রাজ্যের অধিকার চান, তার জন্য প্রণিপাত করবেন কেন? এঁরা ঠিকভাবে প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন তথাপি কৌরবরা বলে অজ্ঞাতবাস কালে ধরা পড়েছিলেন। ভীষ্ম দ্রোণ ও বিদুর অনুনয় করেছেন তথাপি কৌরবরা রাজ্য ফিরিয়ে দেবে না। আমি তাদের যুদ্ধে জয় করে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের চরণে নিপাতিত করব, যদি তারা প্রণিপাত না করে তবে তাদের যমালয়ে পাঠাব। আততায়ী শত্রুকে হত্যা করলে অধর্ম হয় না। তাদের কাছে অনুনয় করলেই অধর্ম ও অপযশ হয়। তারা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য ফিরিয়ে দিক, নতুবা নিহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করুক।"

দ্রুপদ বললেন, "মহাবাহু সাত্যকি, দুর্যোধন ভাল কথায় রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন না। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রের মতেই

চলবেন ভীষ্ম ও দ্রোণ দীনতার জন্য এবং কর্ণ ও শকুনি মূর্খতার জন্য দুর্যোধনের অনুগামী হবেন। বলদেব যা বললেন তা যুক্তিসম্মত মনে করি না। যাঁরা ন্যায়ের পথ ধরে চলে তাঁদের কাছেই অনুরোধ করা সাজে। দুর্যোধন পাপ পথের যাত্রী। তাঁকে নরম কথায় মানানো যাবে না। উনি ভাববেন ওটা দুর্বলের লক্ষণ। অতএব সেনা সংগ্রহের জন্য বন্ধুদের কাছে দূত পাঠানো হোক। কারণ দুর্যোধনও আগে ভাগে দূত পাঠিয়ে দিতে পারে। যাঁর দূত আগে যাবে রাজারা হয়তো তাকেই কথা দিয়ে বসবেন। এখন যা করা উচিত তা তাড়াতাড়ি করতে হবে। বিরাটরাজ, আমার পুরুত এই ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি হস্তিনাপুরে গিয়ে আপনার বক্তব্য ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন ভীষ্ম এবং দ্রোণকে জানিয়ে দিক। কি বলবে এবং কি ভাবে বলবে তা আপনি শিখিয়ে দিন।"

কৃষ্ণ বললেন, "কৌরব ও পাণ্ডবদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সমান সমান। আমরা এখানে বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছি। বিয়ে হয়ে গেছে, এখন আমরা ফিরে যাই। দ্রুপদরাজ, বয়সে আর জ্ঞানে আপনি সবচেয়ে বৃদ্ধ। ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে সম্মান করেন। আপনি আচার্য দ্রোণ ও কৃপের বন্ধু। তাই পাণ্ডবদের যাতে ভাল হয় এমন খবর আপনি-ই পুরুত ঠাকুরের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিন। দুর্যোধন যদি ন্যায় পথে চলে তাহলে কৌরব ও পাণ্ডবদের সম্পর্ক নষ্ট হবে না। আর যদি দুর্যোধন অহঙ্কার ও লোভের ফলে শান্তি না চান তখন আপনি সমস্ত রাজাদের কাছে দূত পাঠাবেন। সবার পরে আমাদেরও একবার ডাকবেন।"

বিরাট রাজার কাছ থেকে সসম্মানে বিদায় নিয়ে বন্ধু বান্ধব নিয়ে কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেলেন। [চলবে]
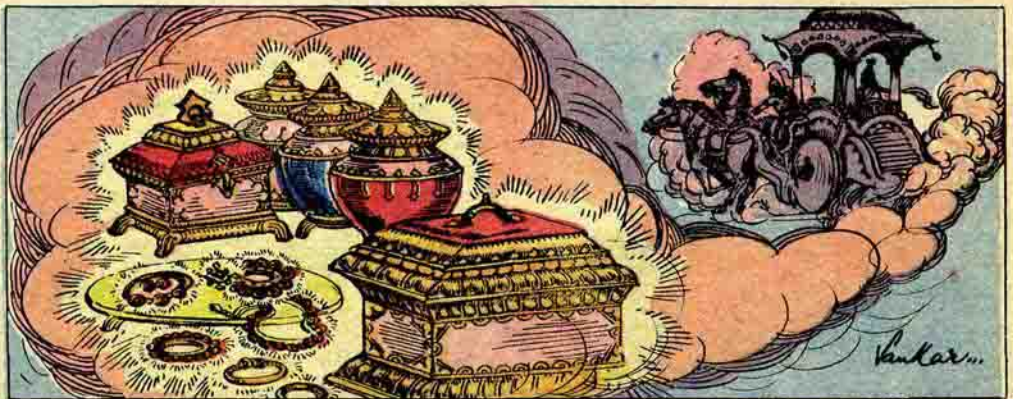
শিবপুরাণ

পাঁচ

প্রাচীনকালে অযোধ্যা নগরে বাহু নামক রাজা শাসন করত। হৈহেয় বংশীয় রাজা অযোধ্যায় হামলা করে রাজা বাহুকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। ফলে বাহু নিজের স্ত্রীদের নিয়ে অরণ্যে চলে যায়।

অরণ্যে থাকাকালীন বাহুর এক স্ত্রী গর্ভবতী হয়। হঠাৎ রাজা বাহুর মৃত্যু হয়। তখন গর্ভবতী পত্নী সহমরণ করতে তৈরি হয়। কিন্তু ঔর্বু নামক মুনি তাকে বাধা দিয়ে বলে যে তার এক পুত্র সন্তান হবে।

একথা জানতে পেরে তার সতীনরা তাকে বিষ খেতে দিল। সেই বিষ পানের ফলে তার পুত্র সন্তান হয়। তাই সেই ছেলের নাম সগর (বিষের সাথে মিশ্রিত) রাখা হল। সগর পরবর্তী কালে এক নাম করা চক্রবর্তী হলেন। এবং মুনি ঔর্বুর সাহায্যে উনি অনেকগুলো অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ছিলেন।

সগরের সুমতী ও কেশিনী নামে দুজন স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তাই তিনি অরণ্যে গিয়ে মুনি ঔর্বুর সাথে দেখা করলেন।

ঔর্বু বুঝিয়ে বললেন যে সগরের স্ত্রীদের গর্ভে সন্তান হবে। তবে তাদের কৈলাশে গিয়ে সন্তান কামনা করে তপস্যা করতে হবে। তাই করল সগর। শিব খুশী হয়ে সগরের সন্তান হবার বর দিলেন।

সগরের নিজের নগরে ফেরার পর তার দুই পত্নী গর্ভবতী হল। আর দুজনরেই দুটো পুত্র সন্তান হল। রাণী কেশিনীর

ছেলের নাম অসমঞ্জস। মুনি ঔবু জানালেন যে সুমতীর যে পুত্র হয়েছে তার মধ্যে ষাট হাজার পুত্র আছে। তখন সেই পুত্রকে ষাট হাজার টুকরো করে মাটির পাত্রে রাখা হল। যে ষাট হাজার টুকরো মাটির পাত্রে রাখা ছিল। সেই ষাট হাজার পাত্রে ষাট হাজার পুত্রের জন্ম হল।

কেশিনীর পুত্র অসমঞ্জস ভীষণ ভয়ঙ্কর ধরণের কাজ করত। ছোট বড় সবাইকে কেটে কেটে নদীতে ফেলা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার এই মারাত্মক ক্ষতিকর কাজের জন্য লোকে সগরের কাছে গিয়ে নালিশ করল। সগর অসমঞ্জসকে রাজধানী থেকে বের করে দিলেন। এর পরে সগর আবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন স্থির করলেন। যজ্ঞের অশ্বের পেছনে নিজের ষাট হাজার ছেলেদেরও ছেড়ে দিলেন।

সগর যে অশ্বকে ছেড়ে দিলেন সেটা এক জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে গায়েব হয়ে গেল। সগরের ছেলেরা সেই অশ্ব খোঁজ করতে করতে হয়রান হয়ে যায়। শেষে ফিরে এসে ওরা বাবাকে জানাল যে অশ্ব গায়েব হয়ে গেছে। একথা শুনে ভীষণ চটে গেলেন সগর। ঐ অশ্ব না নিয়ে রাজধানীতে ফিরতে ছেলেদের বারণ করে দিলেন।

সগরের ছেলেরা আবার ফিরে গেল সেখানে যেখানে অশ্ব গায়েব হয়ে গেছে। সেখানে ওরা জমি খুঁড়তে লাগল। পাতাল পর্যন্ত খোঁড়ার পর সেখানে ওরা মহর্ষি কপিলের দর্শন পেল।

সগরের ছেলেরা ভাবল এই মুনিই হয়ত অশ্ব চুরি করেছে। তাঁকে ধরতে গেল সগরের ছেলেরা। আর যায় কোথায়। রাগে কপিল মুনির চোখ দিয়ে আগুন ঝরতে লাগল। মুহূর্তে ষাট হাজার ছেলে ষাট হাজার ছাইয়ের কণায় পরিণত হল। এই খবর নারদের মাধ্যমে রাজা সগরের কাছে পৌঁছাল। তখন রাজা সগর সেই অশ্বকে আনাতে

অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমানকে পাঠালেন।

অংশুমান কপিল মুনির কাছে পৌঁছাল। অশ্বের ব্যাপারে কোন কথা না বলে হাত জোড় করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। কপিল অংশুমানকে দেখে প্রসন্ন হয়ে বলল, "বৎস, তুমি এই অশ্বকে নিয়ে যাও। আর তোমার ঠাকুর্দাকে বল যে এরা সব এখানে ভস্ম হয়ে আছে।"

"হে মহাত্মা, আমার মৃত পিতাদের স্বর্গপ্রাপ্তির কোন উপায় থাকলে দয়া করে জানান।" অংশুমান কপিল মুনির কাছে প্রার্থনা করল।

"এদের অনেকবার জন্মাবার পরই সম্পূর্ণ পাপ ক্ষালন হবে। তবে তোমার নাতির মাধ্যমে এদের মুক্তি হবে।" কপিল মুনি অংশুমানকে বললেন।

তারপর অংশুমান যজ্ঞের অশ্ব এনে রাজা সগরকে দিল। সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করে অংশুমানকে সিংহাসনে বসাল।

রাজা হওয়ার পরও অংশুমান নিজের পিতাদের কথা মুহূর্তের জন্যও ভোলেনি। একবার গরুড় তাকে বলল, "তুমি যদি গঙ্গাজল এনে ঐ ভস্মের উপর দিয়ে কোন রকমে একবার বওয়াতে পার তাহলে তাদের মুক্তি হবে।"

গঙ্গাকে পৃথিবীতে নামানোর জন্য অংশুমান নিজের ছেলে দিলীপকে রাজ-পাট দিয়ে নিজে অরণ্যে তপস্যা করতে চলে গেল। কিন্তু তপস্যা শেষ হওয়ার

আগেই অংশুমানের মৃত্যু হয়।

তারপর দিলীপের ছেলে ভগীরথ নিজের ঠাকুর্দাদের দুরবস্থার কথা শুনে ওদের উদ্ধার করবে ঠিক করল। শুরু করল ব্রহ্মার জন্য তপস্যা।

ব্রহ্মা বর দিলেন যে সে স্বেচ্ছায় ধর্ম-রক্ষা করে, তাকে পালন করে জীবনযাপন করতে পারে।

তখন ভগীরথ গঙ্গার জন্য দীর্ঘকাল তপস্যা করল। গঙ্গাদেবী দর্শন দিয়ে তার ইচ্ছা জেনে নিয়ে বললেন, "আমি স্বর্গ থেকে যখন পৃথিবীতে নাবব তখন সেই বেগ কে রুখতে পারবে? ঐ তীব্র গতির ফলে আমি তো সোজা পৃথিবী ফুঁড়ে পাতালে চলে যাব।"

এ কথায় ভগীরথ বলল, "হে মাতা, গোটা বিশ্বকে যিনি ধারণ করেছেন সেই শিব আপনাকে ধারণ করবেন।"

"আমি যখন পৃথিবীতে নাবব তখন পাপীরা আমার জলে তাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে নেবে। আমি নিজে ঐ পাপের হাত থেকে কি করে মুক্তি পাব?" গঙ্গা প্রশ্ন করলেন।

"দেবী! সমস্ত পাপ হরণকারী হরি তো রয়েছেন, তিনি যা করার করবেন।" ভগীরথ বলল।

"ভাল কথা! তুমি ধরে কয়ে আমাকে ধারন করতে শিবকে রাজী করাও।" একথা বলে দেবী অন্তর্ধান হলেন।

তারপর ভগীরথ শিবের তপস্যা করে তার দর্শন পেল। শিব গঙ্গাকে ধারণ করতে রাজী হলেন।

আর কি! আকাশ থেকে গঙ্গা সোজা শিবের মাথায় পড়লেন। সেখান থেকে শিবের জটার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে নাবল পৃথিবীতে। ভগীরথ বায়ুর বেগে রথ করে এগিয়ে যেতে লাগল। আর গঙ্গা তাকে অনুসরণ করছিলেন। গঙ্গা প্রবাহিত হল ঐ ষাট হাজার সগর সন্তানের ভস্মের উপর দিয়ে। সৃষ্ট হল সমুদ্র। সেই জন্যেই তখন থেকে সমুদ্রের অন্য নাম সাগর। [চলবে]

৫/দু হাজার বছরের খাল

চীনে খৃষ্ট পূর্ব ২৫০ অব্দে একটি খাল খননের কাজ শেষ হয়। এই খালের জলে আট লক্ষ একর জমি আবাদী হয়ে ওঠে। ফসল ফলে। এই খাল খননের কাজ খৃঃপূঃ ষষ্ঠ অব্দে শুরু হয়। এর দৈর্ঘ্য ১২০০ মাইল। এই খাল পিকিং থেকে হাওচো পর্যন্ত চলে গেছে। এই খালের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে পাথর, মাটি আর কাঠ দিয়ে।

ফটো : ডি. এন. শির্কে
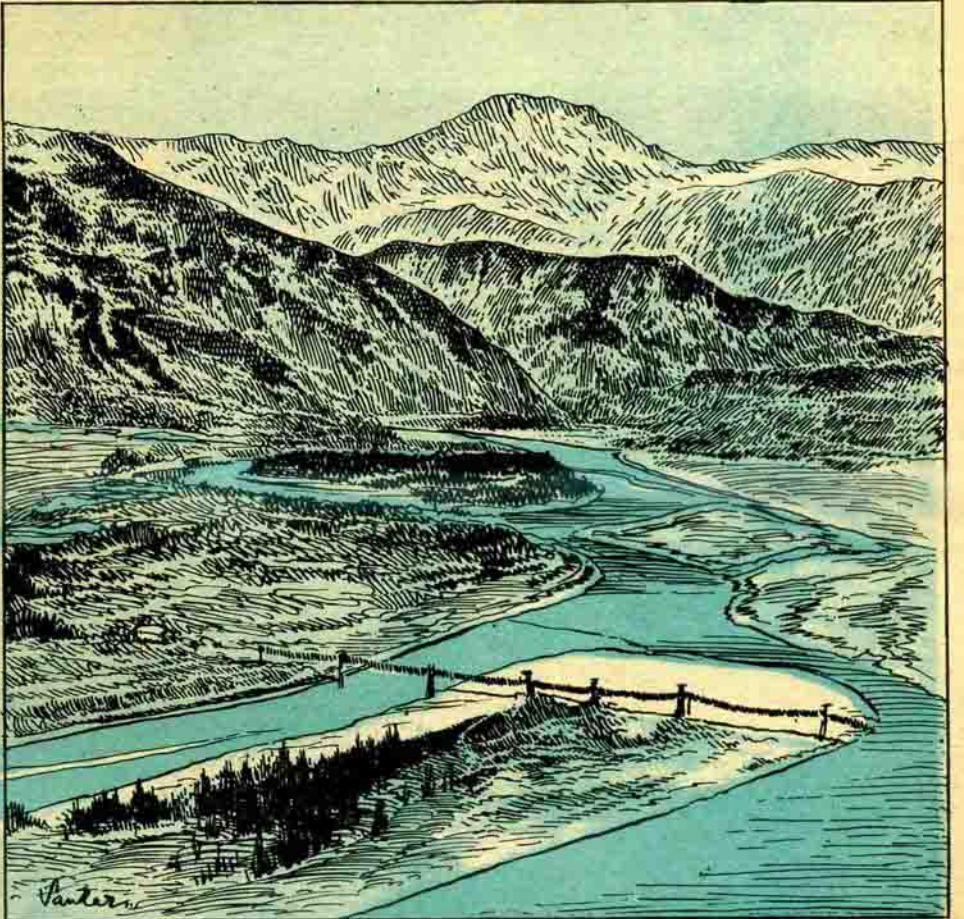
পুরস্কৃত
টীকা

গুনের সাগর

পুরস্কার পেলেন
ডাঃ অশোক চ্যাটার্জি

ফটো : পি. আর্. শিন্দে
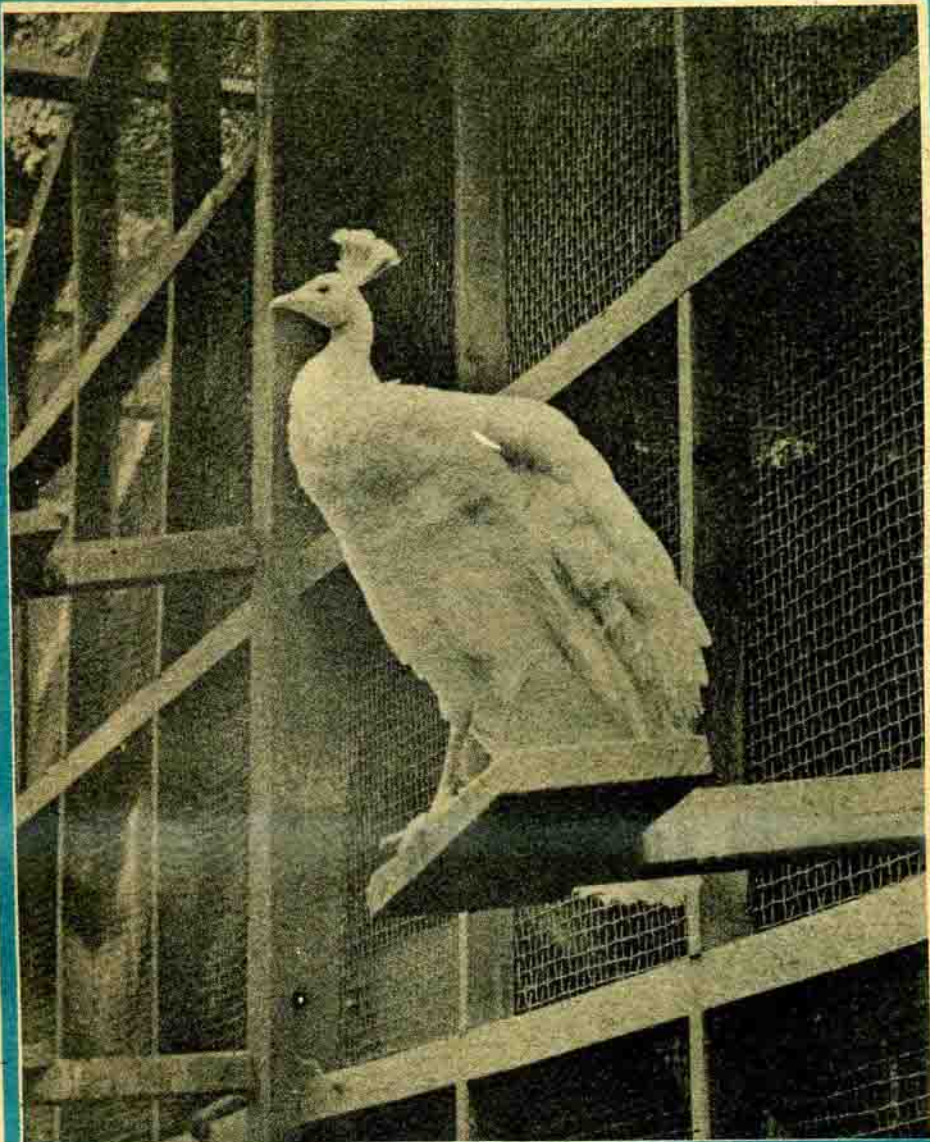
সুভাষ পল্লী,
বার্নপুর, বর্ধমান

রূপের আকর

পুরস্কৃত
টীকা

ফটো-পরিচিতি-টীকা প্রতিযোগিতা :: পুরস্কার ২০ টাকা

★ পরিচয়-টীকা বা নামকরণ ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে পৌঁছানো চাই।

★ পরিচয়-টীকা দু-চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর টীকার মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত পরিচয় টীকা সহ বড় ফটো ফেব্রুয়ারী '৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

★ সফল পরিচয়-টীকা প্রতিযোগীর ঠিকানায় কুড়ি টাকা পাঠানো হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

ভগবানের যাত্রা

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

কনের যাত্রা

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-26. Controlling Editor: 'CHAKRAPANI'

ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার

প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়

শিশুদের বদহজম, অম্বল, পেটব্যাথা, বায়ু, ও দাঁত উঠার সময় ব্যাথার একটি সুস্বাদু সুনিশ্চিত সমাধান

ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

রসেভরা...মনেরমত...মজাদার
মাত্র ২৫ পয়সা!
PARLE
POPPINS
FRUITY SWEETS
নতুন পার্লে
পপিন্স
ফলের স্বাদেভরা লজেন্স
লেবু, জামীর, কমলালেবু, আনারস আর র‍্যাম্পবেরী—এই ৫টি ফলের স্বাদে ভরপুর কমদামের সুন্দর সুন্দর প্যাকে খুব সুস্বাদু ১৩ টি লজেন্স পাওয়া যাচ্ছে।
৫টি ফলের মজা পাবেন, পপিন্স যখনই খাবেন
everest/122d/PPI ben

Photo by : BRAHM-DEV

শিবপুরাণ